সাহিত্যবিতান

দ্বিতীয় ভাগ

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VIII, Vide Notification No. T.B. 76/T.B/8/101 and also Board's letter No. RB/76 DS 1 dated 17.10.77

সাহিত্য-বিতান

দ্বিতীয় ভাগ

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

শ্রীসুকুমার সেন

এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি., এফ. এ. এস.

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

১।১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅশোক ঘোষ রায়
৩/১, রাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২

॥ ভারত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত স্বল্পমূল্যের কাগজে
এই গ্রন্থ মুদ্রিত ॥

চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ

মূল্য : টাকা ৪·২৫ মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসাক
সারদা প্রেস
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



কশ্যপ-আশ্রমে দুষ্যন্ত

[সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্ এবং মানব-হিতৈষীরূপে খ্যাতকীর্তি হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন।' বস্তুতঃপক্ষে তিনি বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের জনক ছিলেন। বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য রচনাটি বিদ্যাসাগর-কৃত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের অংশবিশেষ। এখানে দুর্বাসার শাপের অবসানে রাজা দুষ্যন্ত পত্নী শকুন্তলা এবং পুত্র সর্বদমনের সহিত পুনর্মিলিত হইতেছেন।]

মর্ত্যে প্রত্যাগমন কালে দুষ্যন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ-সারথে! ঐ যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বত, স্বর্ণনির্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি; ভগবান্ কশ্যপ ঐ পর্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব; তুমি রথ স্থির কর, আমি এইস্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ-সারথে! এই পর্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অধিক দূরবর্তী নহে; আপনি এই অশোক বৃক্ষের ছায়ায় কিয়ৎক্ষণ

অপেক্ষা করুন; আমি মহর্ষির নিকট আপনার আগমন সংবাদ নিবেদন করিতেছি।

এমন সময়ে, বৎস! এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে, এখানে যাবতীয় জীবজন্তু স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্যে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না; এমন স্থানে কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে?

রাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে; সিংহশিশু অবিকৃত চিত্তে এই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর রাজা কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপন পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার সেইরূপ হইতেছে কেন?

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর যৎপরোনাস্তি পীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকট যাউক। যদি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী আসিয়া তোমায় জব্দ করিবে। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর অধিকতর

উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দিব।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালক, কই, কি খেলানা দিবে বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। রাজা বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদের সঙ্গে কোনও খেলানা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃন্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্বে জানিতাম না। এদিকে ময়ূর আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত বালক সিংহ-শিশুকে অতিশয় বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তদীয় হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে কোনও মতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত

হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে, এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়।

এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুর্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া বালককে ঋষিপুত্রবোধে তদনুরূপ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবন-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না! এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়; কিন্তু, এস্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই, এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম। এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

বালক নিতান্ত দুর্দান্ত হইয়াও রাজার নিকট এমন শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, এই বালক ঋষিকুমার নহে, ইহা অবগত হইয়া তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম।

পরে রাজা তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেবভূমি মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; তবে এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী বলিলেন, ইহার জননী অপ্সরা-কন্যা, তিনি এখানে আসিলে এই বালকের জন্ম হইয়াছে। রাজা শুনিয়া

মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ, অপ্সরা-কন্যা, এই দুই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহাই হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ ব্যক্তির পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নামকীর্তন করিবেক। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ও কথা আমারেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক।

রাজা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় অপর তাপসী কুটীর হইতে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিয়া কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই, আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমাকে শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা? কি আশ্চর্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবল বেগে জলধারা বহিতে লাগিল। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল।

এমন সময় মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মহারাজ ! এতদিনের পর আপনি ধর্মপত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর রাজা শকুন্তলাকে লইয়া কশ্যপের নিকট উপনীত হইলেন। কশ্যপ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস ! তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই ; দুর্বাসার শাপ-প্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব ; তুমি রথ স্থির কর,"—

উক্তিটি কোন্ রাজার ? তিনি কাহাকে রথ স্থির করিতে বলিলেন ? বক্তা কাহাকে 'প্রণাম ও প্রদক্ষিণ' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ? 'প্রদক্ষিণ' শব্দটির অর্থ কি ?

২। 'এখানে যাবতীয় জীবজন্তু স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্যে কালযাপন করে' —

'এখানে' বলিতে কোন্ স্থানের কথা বুঝানো হইয়াছে ? কোন্ পরিবেশে কে এমন চিন্তা করিতেছিলেন ? 'স্থানমাহাত্ম্য' বলিতে কি বুঝ ?

৩। 'তপোবনের কি অনির্বচনীয় মহিমা!'

উদ্ধৃতাংশটি কাহারো উক্তি, না চিন্তাপ্রসূত মনোভাব? তপোবনের কোন্ মহিমার কথা এখানে বলা হইতেছে? 'বন' এবং 'তপোবন'-এর পার্থক্য কি?

৪। 'এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন।'

বর্তমান অংশে কাহার কথা বলা হইতেছে? তিনি কি কৌতুক দেখিতেছিলেন? "তাঁহাদের" মধ্যে কে কে আছেন? পরবর্তী ঘটনাবলী নিজের গদ্যে লিখ।

৫। 'বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ।'—

কে কাহাকে 'বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিলেন? তিনি উদ্দিষ্ট 'বৎস'কে কি দেখাইতে চাহিতেছেন? 'শকুন্তলাবণ্য' শব্দটির অর্থ কি? উদ্ধৃত অংশটির উত্তরে 'বৎস' কি বলিল?

৬। "কশ্যপ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই; দুর্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল।"

কশ্যপ কে? দুর্বাসা কে? কিভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর দুর্বাসার শাপ বর্ষিত হইয়াছিল? শাপমুক্তির পরবর্তী ঘটনা কি?

৭। রাজা দুষ্মন্ত, তপোবনে উপস্থিত হইবার পর, কিভাবে ধীরে ধীরে পুত্রকে চিনিতে পারিলেন, বর্ণনা কর। প্রসঙ্গক্রমে রাজার অন্তরস্থিত স্নেহরসের পরিচয় দাও।

৮। কোন্ রচনার অন্তর্গত এবং লেখক কে তাহা জানাইয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাওঃ

(ক) আপন পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার সেইরূপ হইতেছে কেন?

(খ) পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্বে জানিতাম না।

৯। টীকা লিখ:—চক্রবর্তিলক্ষণ, মৃগতৃষ্ণিকা, শকুন্তলা।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখিয়া বাক্যরচনা কর:—প্রত্যাগমন, প্রতীয়মান, প্রদক্ষিণ, কর্ণকুহর, প্রবিষ্ট, সমীপে, অনির্বচনীয়, নিরীক্ষণ, যৎপরোনাস্তি, প্রলোভনার্থে, তদীয়, সৌসাদৃশ্য, মৃগতৃষ্ণিকা, স্বপ্নদর্শনবৎ, পরিপ্লুত, সাতিশয়।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:—প্রত্যাগমন, মৃন্ময়, বিস্ময়াপন্ন, নামাক্ষর, উত্তরোত্তর, অন্বেষণ, সাতিশয়, মহর্ষি।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :—মহর্ষি, অবিনয়, অনুচিত, তপোবন, স্নেহরস, সিংহশাবক, ঋষিপুত্র, অপ্সরা-কন্যা, শকুন্তলাবণ্য, উত্তরোত্তর, বিস্ময়াপন্ন, মলিনবেশা।

৪। পদান্তর সাধন কর : -পর্বত, প্রণাম, আশ্রম, উদ্ধত, প্রবিষ্ট, মাহাত্ম্য, অনুচিত, অধিকৃত, উপদ্রব, প্রসারণ, লক্ষিত, মৃন্ময়, উৎসুক, সম্বোধন, মুক্ত, ভ্রান্ত, সাদৃশ্য, প্রীত, আর্দ্র।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর : - প্র—গমন, —দক্ষিণ, বি—র্ক, মাহা—, অনি—চনীয়, প্রলোভনা—, ত—নুরূপ, —সাদৃশ্য, পা—ত্মা, বিস্ম—পন্ন, পরি—ত, —তিভ্রংশ।

৬। চলিত ভাষায় লেখ :—রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালক, কই, কি খেলানা দিবে বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। (ক) 'কশ্যপ-আশ্রমে দুষ্মন্ত' বিদ্যাসাগরের কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) দুষ্মন্তের পুত্রের নাম কি? পত্নীর নাম কি?

২। এই রচনায় যে কয়টি চরিত্রের সঙ্গে তুমি পরিচিত হইয়াছ—তাহাদের নাম কর।

৩। (ক) অপরিচিত ছেলেটিকে দেখিয়া রাজার কেন কোলে তুলিয়া লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, বল।

(খ) 'মৃগতৃষ্ণিকা' শব্দটা শুনিয়াছ? মানে কি বলিতে পারো? মৃগের সঙ্গে ইহার কি কোন সম্পর্ক আছে?

দেবী চৌধুরাণীর এজলাস্

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একাধারে বাংলার সাহিত্যসম্রাট এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্কিম যথার্থই সব্যসাচীর ভূমিকা লইয়াছিলেন। ইনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক; তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'র অংশ-বিশেষ নিম্নোক্ত রচনাটি। ইতিহাসের দেবী চৌধুরাণী দস্যুদলনেত্রী ছিল, কিন্তু বঙ্কিমের দেবী লুণ্ঠনের পাপ হইতে মুক্ত; তিনি আর্ত মানুষের সেবিকা।]

সোমবারে প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজলাস্"। সে এজলাসে কোন মোকদ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী-রাণীর এজলাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তাহার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশ-ভূষায় আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ি পরা। শাড়িখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী

আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবী প্রতিমার মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। তুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবর্দার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচশত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের তুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোক একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেননা, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশে লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেইজন্য কেহ কখনও তাঁহার সন্ধান ইংরেজদের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একপ্রহর রাত্রি হইল। তখন দান

শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছুদিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুডল্যাড সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎ-বস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচপত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। বাংলাদেশের ইতিহাস হইতে দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে কি জানা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী ও ইতিহাসের দেবী চৌধুরাণীতে পার্থক্য কি?

২। 'এজলাস্' শব্দটির অর্থ কি? বাংলা শব্দভাণ্ডারে এই শ্রেণীর শব্দকে কি জাতীয় শব্দ বলা হয়? দেবী চৌধুরাণীর এজলাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। 'দেবী চৌধুরাণীর এজলাস্' রচনা হইতে দেবীর বেশ-ভূষার বর্ণনা দাও। এই রচনা হইতে দেবী চৌধুরাণীর চারিত্রিক কি কি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়?

৪। 'দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।' আলোচ্য অংশে 'দেবী' বলিতে কাহাকে বোঝানো হইয়াছে? তাঁহার 'ডাকাইতি'র কি জাতীয় পরিচয় লেখক আলোচ্য রচনায় প্রস্ফুটিত করিয়াছেন?

৫। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) কোন্ দিবসে দেবী চৌধুরাণীর 'এজলাস্' বসিয়াছিল? উক্ত এজলাসে কি কার্য হইয়াছিল?

(খ) দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে কাহারা দাঁড়াইয়াছিল? তাহাদের সাজসজ্জার বর্ণনা দাও।

(গ) দেবীর নিকট হইতে দানগ্রহণ করিবার জন্য সংখ্যায় কত জন দরিদ্র জমায়েত হইয়াছিল? কে তাহাদের এক এক করিয়া দেবীর নিকট আনিতেছিল? দেবী তাহাদের কেমনভাবে দান করিতেছিলেন?

(ঘ) রঙ্গপুরে গুডল্যাড সাহেবের নিকট কি সংবাদ পৌঁছিল? আরও কি রটিল?

৬। রচয়িতার নাম উল্লেখ এবং কোন্ রচনার অন্তর্গত তাহা লিখিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও:

(ক) এ সব দেবীর রাণীগিরি।

(খ) দেবী ভগবতীর অংশে লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর: প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত, চাঁদওয়া, কিংখাপ, সাষ্টাঙ্গে, জমায়ৎবস্ত, আসীন।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: কাননাভ্যন্তরে, পরিষ্কার, উজ্জ্বল।

৩। ব্যাসবাক্য লিখিয়া সমাস নির্ণয় কর: প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত, কাননাভ্যন্তরে, বেশভূষা, গৌরবর্ণ, দেবীপ্রতিমা, লাল-নিশান, সাষ্টাঙ্গে।

৪। পদান্তর সাধন কর: নিবিড়, শরৎ, মধুর, প্রণাম, দরিদ্র, দরবার।

॥ মৌখিক প্রশ্নবলী ॥

১। 'দেবী চৌধুরাণীর এজলাস্' বঙ্কিমের কোন্ উপন্যাসের অন্তর্গত? বঙ্কিমের লেখা আর দুই-একটি উপন্যাসের নাম কর।

২। দেবীর 'এজলাসে'র জন্য কত বিঘা জমি সাফ করা হইয়াছিল? বড় বড় গাছগুলি কি কাটা হইয়াছিল? কেন?

৩। বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণেরাও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিল কেন?

৪। দেবী কতক্ষণ দরিদ্রদের দান করিলেন?

পলাশীর যুদ্ধ

[১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিখিলনাথ রায়ের জন্ম হয়। বাংলার নবাবী আমল ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্বের তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণী আলোচনা করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামক গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ। আলোচ্য রচনায় পলাশীর যুদ্ধ এবং তাহার পূর্বপ্রস্তুতি পর্বের অন্তরঙ্গ চিত্র লেখক ইতিহাস-চর্চার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।]

নবাব দুর্লভরামকে সসৈন্যে পলাশীতে অবস্থান করিতে আদেশ দিলে দুর্লভরাম আপনার সৈন্য লইয়া পলাশী-প্রান্তরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে সিরাজের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল—জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি তাহার অধিনায়ক। ইয়ার লতীফ খাঁ নামে নবাবের একজন সেনাপতি নবাবী প্রাপ্তির আশায় ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; মীরজাফরও সেই মর্মে আবেদন করেন। ইংরেজরা মীরজাফরকে নবাবী দিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু ইয়ার লতীফকে আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজরা নবাবকে পলাশী প্রান্তর হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলে নবাব প্রথমে স্বীকৃত হন, কিন্তু অবশেষে ইংরেজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ক্লাইবও চতুরতাপূর্বক লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। যখন উভয় পক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন উভয় পক্ষই পলাশী-প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরেজসৈন্য পলাশীর দিকে যাত্রা করিয়া ২২-এ জুন রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হয় এবং পলাশীর আম্রকুঞ্জ-মধ্যে আশ্রয় লয়। মীরজাফর প্রভৃতির অভিসন্ধি নবাব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্কট-সময়ে মীরজাফরের সহিত বিবাদ মিটাইয়া প্রথমে তাঁহাকেই পলাশী অভিমুখে যাইবার আদেশ দেন।

বলা বাহুল্য, মীরজাফর তখনও মৌখিক সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মীরজাফর পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিবার পর, ইংরেজদিগের পৌছিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা পূর্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবাব পলাশী পৌঁছিলে, তাঁহার সমস্ত সৈন্য এক পরিখা-বেষ্টিত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। পরিখার সম্মুখে একটি বুরুজ নির্মাণ করিয়া, তাহাতে কামানশ্রেণী সংস্থাপন করা হইল। ২৩-এ জুন প্রাতঃকালে নবাব-সৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া আম্রকুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রান্তর বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সিন্‌ফ্রে বা সেণ্ট ফ্রায়াস নামে একজন ফরাসী গোলন্দাজ সেনাপতির নায়কত্বে কতিপয় ফরাসী-সৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্যের কিয়দংশ আম্রকুঞ্জের সন্নিহিত বৃহত্তর পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মীরমদন এবং মীরমদনের পশ্চাতে মোহনলাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে, আম্রবন অতিক্রমপূর্বক প্রায় পলাশী গ্রাম পর্যন্ত নবাব-সৈন্য দুর্লভরাম, ইয়ার লতীফ ও মীরজাফরের অধীনে সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল—এই তিন জনই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারিগণের নেতা, ইঁহাদেরই নেতৃত্বে নবাবের সর্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য ছিল। যুদ্ধকালে ইঁহারা সামান্য মাত্র পদবিক্ষেপও করেন নাই। ক্লাইব আম্রকুঞ্জের নিকটবর্তী শিকার-মঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্য-সাগর নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে আম্রবন হইতে বহির্গত হইতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সম্মুখে একটি সামান্য বুরুজ নির্মাণ করিয়া, তাহাতে কামানশ্রেণী সংস্থাপন করা হইল।

বেলা আট ঘটিকার সময় প্রথমে সিন্‌ফ্রের অধীনস্থ সৈন্যগণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। ইংরেজরাও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিন ঘণ্টা এইভাবে যুদ্ধ চলিল। ক্লাইব কোনরূপ সুবিধা বুঝিতে না পারিয়া সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ হটিয়া আম্রকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন এবং অন্যান্য সামরিক কর্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে নবাবকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় নবাবের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইংরেজরা আপনাদিগের বারুদ আবরণ দ্বারা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায়, নবাবকে বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ইংরেজ-সৈন্য আম্রকাননে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, নবাবের সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতেই ইংরেজদিগের একটি গোলা আসিয়া তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিক-রূপে আহত করিল ; ইহাতে নবাব-সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মীরমদনের পশ্চাদ্ভাগে হিন্দু-বীর মোহনলাল অবস্থিতি করিতেছিলেন ; তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, ইংরেজদিগকে মথিত করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইলেন।

মীরমদনের পতন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সিরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মীরজাফরকে আহ্বান-পূর্বক তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া, সেই আসন্ন বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মীরজাফর সে দিবস নবাবকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উত্তর দিলেন যে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলে আর কিছুতেই জয়ের আশা থাকিবে না। সিরাজ

মীরজাফরকে মোহনলালের কথা জানাইলে, মীরজাফর উত্তর দিলেন যে, তিনি নবাবকে সময়োচিত সৎপরামর্শই দিয়াছেন ; এক্ষণে নবাবের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। মীরজাফরের এইরূপ উত্তর শুনিয়া সিরাজ আরও ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং পুনর্বার মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। বারংবার এবংবিধ আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া যেমন প্রতিনিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি নবাব-সৈন্য চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ-সৈন্য আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া নবাব-সৈন্যের উপর মহাবেগে আপতিত হইল।

এদিকে নবাব-সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিশ্বাস-ঘাতক সেনাপতিত্রয় ইংরেজদিগকে কোনপ্রকার বাধা প্রদান করিল না। কিন্তু সেনাপতি সিন্‌ফ্রে ইহাতে বিচলিত না হইয়া আপনার অধীন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগের গতিরোধ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ হটিয়া নবাবের বুরুজ, পরিখাভ্যন্তর এবং পাহাড়ী হইতে ক্রমান্বয়ে গোলাগুলি চালাইতে লাগিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, পলাশীযুদ্ধের মধ্যে এইটুকুই প্রকৃত যুদ্ধ। সিন্‌ফ্রে শত চেষ্টা করিয়াও ইংরেজদিগের গতিরোধ ও নবাবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইংরেজরা নবাবের পরিখাবেষ্টিত শিবির অধিকার করিলেন। কিন্তু সিরাজ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

এইরূপে পলাশীর যুদ্ধের অবসান হইল। ২৯-এ জুন (১৭৫৭ খ্রীঃ) ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরকে মস্‌নদে উপবেশন করাইলেন।

—নিখিলনাথ রায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "তিন ঘণ্টা এইভাবে যুদ্ধ চলিল"।—এখানে কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে? তিন ঘণ্টা কিরূপ যুদ্ধ চলিয়াছিল? ঐ যুদ্ধারম্ভের পূর্বে পলাশীর প্রান্তরে নবাব ও ইংরেজ, উভয় পক্ষের সৈন্য-সমাবেশের বিবরণ দাও।

২। পলাশীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কে কে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন? উঁহাদের সাহসের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

৩। "এই তিনজনই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারিগণের নেতা"—'তিনজন বিশ্বাসঘাতকে'র নাম লিখ। উহাদের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার যে চিত্র আলোচ্য রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা কর।

৪। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) "মীরজাফরও সেই মর্মে আবেদন করেন।" মীরজাফর কে? তিনি কাহাদের নিকট কি আবেদন করিয়াছিলেন? ঐ আবেদন কি রক্ষিত হইয়াছিল?

(খ) "ইহাতে নবাব-সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।"—এখানে কোন্ নবাবের কথা বলা হইয়াছে? কেন তাঁহার সৈন্যরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল? ঐ সময়ে কে তাহাদের উৎসাহ দান করিয়াছিল?

(গ) নবাব কেন মোহনলালকে বারংবার যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন? মোহনলাল প্রথমে কেন ঐ নির্দেশ মানিতে চাহেন নাই? তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার পর ঘটনার গতি কোন্ দিকে চলিল?

(ঘ) "কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে পলাশী যুদ্ধের মধ্যে এইটুকুই প্রকৃত যুদ্ধ।"—কোন্‌টুকু 'প্রকৃত যুদ্ধ'? এইটুকু প্রকৃত যুদ্ধ কেন? এই যুদ্ধের নায়ক কে ছিলেন?

৫। "পলাশীর যুদ্ধ" রচনাটি কাহার লেখা? এই রচনায় লেখক কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক চরিত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন? উক্ত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। শব্দগুলি স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর: সন্নিবেশ, কর্ণপাত, মৌখিক, সদ্ভাব, সংস্থাপন, প্রত্যুত্তর, উষ্ণীষ, প্রতিনিবৃত্ত, মসনদ, আপতিত, ইতিকর্তব্যবিমূঢ়।

২। উপরে লিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ।

৩। সন্ধি কর: প্রতি+উত্তর, পশ্চাৎ+ভাগে, সর্ব+অপেক্ষা, সৎ+ভাব।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: পলাশী-প্রান্তর, সিংহাসনচ্যুত, ফরাসী-সৈন্য, শ্রেণীবদ্ধ, অশ্বারোহী, ছত্রভঙ্গ, গতিরোধ।

৫। স্থূলাক্ষরগুলি কোন্ বর্গের অন্তর্গত লিখ: **ন**বাব, **প**লাশী, সময়োচি**ত**, **ধা**বিত, একমাত্র, ভিজিয়া, উপবে**শ**ন।

৬। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর:

(ক) ইংরেজরা নবাবকে পলাশী-প্রান্তর হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলে নবাব প্রথমে স্বীকৃত হন। (খ) তিনি ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মীরজাফরকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া, সেই আসন্ন বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। (গ) ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরকে মস্‌নদে উপবেশন করাইলেন।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। কোন্‌টি সঠিক উত্তর বল:

(ক) ১৭৫৭/১৮৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

(খ) তিনজন বিশ্বাসঘাতকের নাম: সিন্‌ফ্রে, জগৎশেঠ, মীরমদন, মীরজাফর, মোহনলাল, রায়দুর্লভ।

(গ) প্রতিনিবৃত্ত শব্দের অর্থ অগ্রসর/বিরত।

২। পলাশীর যুদ্ধ রচনায় যে নবাবের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার নাম কি? তাঁহার সঙ্গে কাহার যুদ্ধ হইয়াছিল? ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল?

৩। (ক) যুদ্ধের সময় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার ফলে উভয় পক্ষের বারুদের কি অবস্থা হইয়াছিল?

(খ) মীরমদন কেমনভাবে আহত হইলেন?

(গ) ইংরেজরা নবাবের শিবির অধিকার করিবার সময় নবাব কি করিতেছিলেন?

রাজা রামমোহন রায়



[শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, ধর্মসংস্কারক, লোকসেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক। প্রাবন্ধিকরূপেই তিনি বাংলাসাহিত্যে বিখ্যাত—অবশ্য কাব্য ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁহার প্রবণতা ছিল। উনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের নব-জাগরণের পথিকৃৎ রামমোহনের সামগ্রিক পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত। তথ্য ও তত্ত্বের প্রাচুর্য, অনবদ্য ভাষা এবং রচনাভঙ্গীর গুণে নিবন্ধটি বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে।]

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে নিজ ভবনে সামান্যরূপ শিক্ষা দিয়া ৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ে পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ১৫।১৬ বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হন। এরূপ জন-শ্রুতি যে, পাটনা বাসকালে কোরান পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ঐ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্তন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া নাকি তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই মনান্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানাদেশ ও নানাতীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও

পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাঁহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত হন। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করেন। পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজ-গবর্নমেণ্টের অধীনে চাকুরী স্বীকারপূর্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর্ম করিয়া, অবশেষে রংপুরের কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ অব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুরশিদাবাদে গমন করেন ; এবং সেখানে "তহতুল মোহদ্দীন" নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে দশ বৎসর বিষয়কর্ম করিয়া তিনি ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা নগরে স্থায়িরূপে আসিয়া বাস করেন।

তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে "আত্মীয়-সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে শহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন।

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামক একজন মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, এবং দম্ভ করিয়া বলেন যে, বঙ্গদেশে

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য রামমোহন রায় বেদ-বেদান্তের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা বলিতেছেন। এই সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার করিবার জন্য বিহারীলাল চৌবে নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন ব্রাহ্মণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্তা শহরে প্রচার হইলে, সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাজপতি রাধাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী পরাভব স্বীকার করিলেন; নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই বার্তা যখন তাড়িত বার্তার ন্যায় শহরে ব্যাপ্ত হইল, তখন বিপক্ষদলের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল।

একদিকে যেমন আত্মীয়-সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটি হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে লর্ড আমহার্স্ট গবর্নর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাহাতে হিন্দুবিধবাগণের সহমরণ-

প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় ; এবং সহমরণ-প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থাপিত হয়।

ইহার পূর্বে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুলাই গবর্নর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য বলিলেন, বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কিছু করা হইল না।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে গবর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধানকার্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকর্মচারীর নিকট অনুমতি-পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ-মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দুবিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন ; তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন ; এবং পূর্বোক্ত আবেদনপত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্নমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদনপত্র গবর্নর-জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের

লোকের তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিয়া উঠিল।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাক্শন নামে একটি কমিটি স্থাপিত হয়। ঐ কমিটি তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতী-দিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সমগ্র কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল। তখন তিনি এই কার্যের প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষদিগের মধ্যে এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়া পড়িল। একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে। আর একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল।

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে

গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য নীতি ও পাশ্চাত্ত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরে যেমন তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি তাঁহার উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরপ্রীতি অপেক্ষা মানবপ্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্যের চালক ও পোষক ছিল। এই উদার সার্বভৌমিক ভাব হইতেই তাঁহার উদার সার্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের কাহারও দুঃখ সহিতে পারেন নাই ; সেই জন্য দুষ্কর নরসেবাব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁহার মানবপ্রীতি সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

—**শিবনাথ শাস্ত্রী**

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা কর :

(ক) রামমোহনের বাল্যকাল, বিদ্যাশিক্ষা, গৃহত্যাগ এবং তিব্বত গমন।

(খ) তিব্বত হইতে আগমন, সংস্কৃত শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা এবং সরকারী চাকুরী।

(গ) পিতৃবিয়োগ, মুর্শিদাবাদ গমন, 'তহতুল মোহদ্দীন' রচনা এবং কলিকাতা আগমন।

(ঘ) আত্মীয়-সভা স্থাপন, একেশ্বরবাদ প্রচার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, বিপক্ষদলের ক্রোধ।

(ঙ) হিন্দুকলেজের কমিটি হইতে বিতাড়ন, নিজে বিদ্যালয় স্থাপন, সতীদাহ-প্রথার বিরোধিতা এবং ঐ বিষয়ে পুস্তিকা রচনা ও প্রচার।

(চ) কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনা, ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে মত এবং লর্ড আমহার্স্টকে পত্র।

২। "তাহা লইয়া নাকি তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে।" এখানে কাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে? কি লইয়া তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল? এই মনান্তরের পর পুত্র কি করিয়াছিলেন?

৩। "এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য"—এ সম্বন্ধে বলিতে লেখক কি ইংগিত করিতেছেন? উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি কি?

৪। "এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।"—রামমোহন রায় কে? এইস্থানে কোন্ বিবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে? এবং কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে? রামমোহনের আবির্ভাবের পর ঘটনার গতি কোন্ পথে অগ্রসর হইল?

৫। "এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল।"—কোন্ সময় হইতে 'দ্বিতীয় দল' প্রবলতা লাভ করিল? 'দ্বিতীয় দলে'র বক্তব্য কি ছিল? 'প্রথম দল'ই বা কোন্ মতবাদের পরিপোষক ছিল?

৬। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাকেই এই "নবযুগের প্রথম শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে"।—লর্ড আমহার্স্ট কে? উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু কি? লেখক কি কারণে উক্ত পত্রটিকে 'নবযুগের প্রথম শঙ্খধ্বনি' বলিতে চাহেন?

৭। 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া 'মানুষ রামমোহন সম্বন্ধে' তোমার কি ধারণা হইয়াছে বিবৃত কর।

৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

(ক) তহতুল মোহদ্দীন, (খ) আত্মীয়-সভা, (গ) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, (ঘ) রাধাকান্ত দেব, (ঙ) একেশ্বরবাদ, (চ) নিজামত আদালত, (ছ) ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য, (জ) সহমরণ, (ঝ) কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখিয়া বাক্যে ব্যবহার কর:

জনশ্রুতি, পৌত্তলিকতা, নিবন্ধন, প্রতীচ্য, জনহিতৈষণা, সার্বভৌমিক, মূলমন্ত্র।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: মনান্তর, সন্ন্যাসী, মতাবলম্বী, পশ্চিমাঞ্চল, লোকারণ্য, তন্নিবন্ধন, ধর্মানুমোদিত, পূর্বোক্ত।

৩। অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ কর: সামাণ্য, পর্যাটন, স্মরণীয়, পরিস্কার, অণুকরনীয়, সার্বজনীন, সংকীর্ণ।

৪। ব্যাসবাক্য লিখিয়া সমাসের নাম দাও: দোষকীর্তন, মনান্তর, পিতৃভবন, প্রাণহানি, সংস্কার-প্রয়াসী, ব্রহ্মোপাসনা, রাজবিধি, একেশ্বরবাদ, আবেদনপত্র, দলাদলি, নরসেবাব্রত।

৫। পদান্তর সাধন কর: অশ্রদ্ধা, সংস্কৃত, প্রচারিত, আয়োজন, শাস্ত্রীয়, ক্রোধ, সম্মত, তাড়িত, সদাচার, ব্যয়িত, স্মরণীয়, বিশ্বাস, সার্বভৌমিক, আলিঙ্গন।

৬। চলিত ভাষায় রূপান্তর কর:

(ক) ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ঐ **পৌত্তলিক** প্রণালীর দোষ-কীর্তন করিয়া **পারসীতে** এক গ্রন্থ রচনা করেন।

(খ) একদল বলিতে লাগিলেন, **প্রাচীন** যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই **রাখিতে হইবে**।

(গ) তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের কাহারও দুঃখ সহিতে পারেন নাই; **সেইজন্য** দুষ্কর **নরসেবাব্রতে** আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

৭। উপরের প্রশ্নের স্থূলাক্ষর শব্দগুলি কি জাতীয় পদ, লিখ।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। রামমোহনের ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা পাঁচটি বাক্যে প্রকাশ কর।

২। নরসেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, এমন দুইজন মনীষীর নাম কর।

৩। একটি করিয়া উদাহরণ দিয়া প্রমাণ কর যে, রামমোহন (ক) দয়ার্দ্রচিত্ত (খ) নবযুগের প্রবর্তক।

৪। রামমোহনের নামের পূর্বে 'রাজা' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়?

৫। রামমোহনের লেখা কয়েকটি গ্রন্থের নাম কর।



যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বিচিত্রমুখী এবং বহুধর্মী প্রতিভা পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে বুঝি দুর্লভ। ঐতিহ্যময় জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। কবিতা রচনার জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিলেও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যসাধারণ; তদুপরি সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্পেও তাঁহার প্রতিভা স্বীকৃত। বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই স্রষ্টা। নিম্নোদ্ধৃত 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প।]

এক সময়ে যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপ-ব্যাঙ-বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্‌গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন। এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোন একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া আছেন। অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজসাহীতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি না থাক্, বিষয়-আশয় আছে। পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিল। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক। উকিল ভাবিলেন, "এ তো মুশকিলে পড়িলাম।" অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এসো, বাবা, এসো।" কিন্তু কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জ সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া

জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন। বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন, কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর-সব ঠিক হইল, কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়া-শিবতলায় সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীন কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল। ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাঁহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছেন। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছেন, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছেন। এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুইদিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই

গুটিকতক হাতি ও পাল্‌কি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া, বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যা-কর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিল।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন তাহার চারিদিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমতো যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।"

বরযাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা চিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব। বিদেশের বরযাত্রগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান।"

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?"

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা, তবে আনো" বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল।

আহারস্থানের চারিদিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।"

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়?" যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমতো ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কা সত্ত্বেও অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন,

"ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্রেরা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন; তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমাদের এ কী রকম ব্যবহার।" বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া সে পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইল। গোয়ালাদিগকে বলিল, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলো আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল—বিভূতি কহিল, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌছিতে লাগিল।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। তোমার পঠিত 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পটি নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

২। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্প পাঠ সমাপ্ত করিয়া তোমার মনে কি অনুভূতির সৃষ্টি হয়? এই গল্পে কোন্ চরিত্রটি তোমার ভাল লাগে এবং কেন?

৩। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পে সমাজের ,একটি নিখুঁত বাস্তব ছবি আছে। ঐ ছবিটি কিরূপ বুঝাইয়া বল।

৪। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। আলোচ্য কাহিনীর নূতন একটি নামকরণ কর ও তাহার সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

৫। "বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।"—এখানে কাহার কথা বলা হইয়াছে? বিভূতি কে? বিভূতিকে জামাইরূপে পাওয়া অসম্ভব বোধ হইতেছিল কেন? শেষ পর্যন্ত সে কিভাবে জামাই হইল?

৬। "সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে।" —'সকলে' কে কে? 'স্পর্ধিত দরিদ্র'ইবা কে? তোমার মতে উঁহাকে কি সত্যই উক্ত বিশেষণে ভূষিত করা যায়? তাঁহাকে কিভাবে অপদস্থ করা হইল? পরিসমাপ্তিতে কি ঘটিল?

৭। "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।" —উক্তিটি কাহার? তাঁহাকে কাহারা নির্যাতন করিতেছিল? তিনি কিভাবে নির্যাতিত হইতেছিলেন?

৮। যজ্ঞেশ্বরকে নির্যাতন করিবার প্রতিফল গৌরসুন্দর কিভাবে পাইলেন?

৯। সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) "শুনিয়া মাতৃহীন কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন।"—কোন্ রচনা হইতে উদ্ধৃত অংশটি গৃহীত? রচনাটির লেখক কে? মাতৃহীন কন্যাটির পরিচয় দাও। কি শুনিয়া তাহার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন? দিদিমার বক্তব্য কি ছিল?

(খ) "ভয় কি ঠাকুর, ছানা চিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।"—কাহারা কাহার উদ্দেশে এই অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল? এই বক্তাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

(গ) "বাবা, আমাদের এ কী রকম ব্যবহার?"—কে কাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে? প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া বক্তার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি লিখ।

(ঘ) "গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌছিতে লাগিল।" —গৌরসুন্দর কে? অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলী বিবৃত কর। 'ছানা যথাস্থানে পৌছিতে লাগিল'—এ বাক্যটির অর্থ কি?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর: সাপ-ব্যাঙ-বাদুড়, সৌভাগ্যশশী, কৃষ্ণপক্ষ, সৎপাত্র, পল্লীগৃহ, অপদস্থ, বিধিবিড়ম্বনা, আটচালা, করাঘাত, শ্রাবণধারা, অনাহার, অকল্যাণ, শঙ্কা, বরযাত্রী।

২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর এবং কোন্ কোন্ বর্ণে মিলন হইয়াছে লিখ: শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূর্বোক্ত, উদ্যোগ, স্নানাহার, করাঘাত, আশান্বিত।

৩। পদান্তর সাধন কর: সমর্পণ, নিরীহ, নিষ্পত্তি, স্পর্ধিত, রুদ্ধ।

৪। বন্ধনীমধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও:

(ক) টপ্ টপ্ (কি জাতীয় শব্দ), (খ) মনে মনে (সমাস), (গ) স্টেশন, মুশকিল, হাজির, ট্রেন (কোন্ শ্রেণীর শব্দ), (ঘ) জলাঞ্জলি (সন্ধি), (ঙ) **বড়োঘরে** না হইলে (কারক), (চ) চলিতে (কি জাতীয় ক্রিয়া)।

৫। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর: খোড়ো, সৌভাগ্যশশী, পূর্বোক্ত, শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত, পর্যটন, যথাসর্বস্ব, বিধিবিড়ম্বনা, পাংশুবর্ণ।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' কাহার লেখা? ঐ লেখকের লেখা আর কি কি গল্প পড়িয়াছ? এই গল্পটি কোন্ ভাষায় লেখা—সাধু, না, চলিত?

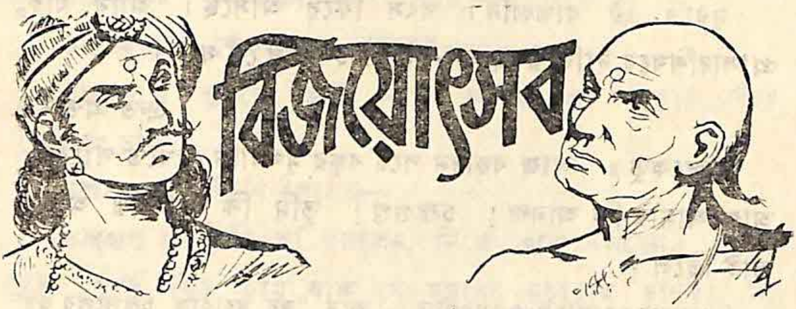
২। (ক) 'ভগবদ্গীতা' কি? গ্রন্থটি কোন্ ভাষায় লেখা?
(খ) ভগবান প্রজাপতি বলিতে কি বুঝ?

৩। (ক) কমলা কে? তাহার ঐ নাম রাখা হইয়াছিল কেন?
(খ) বিভূতিভূষণ কোথায় কলেজে পড়িত? বিভূতিভূষণ কে?

৪। (ক) বিভূতিভূষণ কাঁচাগোল্লা খাইতে চায় নাই কেন?
(খ) গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইয়াছিলেন কেন?

৫। (ক) 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পটির ঘটনাস্থল কোথায়?
(খ) ঐ গল্পের গোয়ালারা কোন্ পাড়ার?

৬। বুঝাইয়া দাও: "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়?"



[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৯১৩ খ্রী.। মূলতঃ স্বদেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটকের স্রষ্টারূপে তিনি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতিমান হইলেও কবিতা ও হাসির গান রচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান সর্বস্বীকৃত। নিম্নে উদ্ধৃত "বিজয়োৎসব" নাট্যাংশটি তাঁহার বিখ্যাত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত"-এর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। কাহিনী-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে, রচনা-চাতুর্যে এবং সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বর্তমান নাট্যাংশে চন্দ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য-বিজয়কে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত নাট্য-পরিস্থিতি বর্ণিত। আলোচ্য-অংশের এই স্বল্প পরিসরেও আমরা ঘটনার উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের নিখুঁত বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি।]

স্থান—পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

মুরা ॥ চন্দ্রকেতু! আজ চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে মগধে ফিরে আসছে। নগরে উৎসব নাই কেন?

চন্দ্রকেতু ॥ মন্ত্রী চাণক্যের নিষেধ।

মুরা ॥ সে কি! গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যের বিজয়ে উৎসব করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন? এ কিরূপ বিচার?

চন্দ্রকেতু ॥ মন্ত্রিবর যখন নিষেধ করেছেন তখন নিশ্চয়ই তার বিশেষ কোন কারণ আছে।

মুরা ॥ এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষা।

চন্দ্রকেতু ॥ সে বিজয়গৌরবের কে সূচনা ক'রে দিয়েছিল মা? ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার করবেন না।

মুরা ॥ ঐ বাদ্যধ্বনি। বৎস ফিরে আসছে। আমি যাই, প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে প্রবেশ-সমারোহ দেখি গে যাই।

(দ্রুত প্রস্থান)

চন্দ্রকেতু ॥ আজ বহুদিন পরে বন্ধুর মুখখানি দেখতে পাবো। আজ আমার কি আনন্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি পূর্বজন্মে আমার ভাই ছিলে?

[নেপথ্যে কোলাহল ও যন্ত্রসঙ্গীত। ক্রমে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়" ধ্বনি ঘন ঘন নিনাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। পরে পতাকাধারী ও সৈনিকগণসহ চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিলেন।]

চন্দ্রকেতু ॥ এসো বন্ধু! (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ (রুক্ষভাবে) চন্দ্রকেতু! আমার আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু ॥ কি আদেশ প্রিয়বর?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ আমার আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত হবে। —এ আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু ॥ পেয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ সে আদেশ পালিত হয় নাই কেন?

চন্দ্রকেতু ॥ মন্ত্রীর নিষেধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তা পূর্বেই অনুমান করেছিলাম। চন্দ্রকেতু! মগধের মহারাজা আমি, না চাণক্য?

চন্দ্রকেতু ॥ শোন বন্ধু—

চন্দ্রগুপ্ত ॥ উত্তর দাও। মগধের মহারাজা আমি, না আমার মন্ত্রী?

চন্দ্রকেতু ॥ মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তবে?

চন্দ্রকেতু ॥ প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত ॥ শুনতে চাই না। মন্ত্রীকে ডাকো।

চন্দ্রকেতু ॥ শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত ॥ শুনতে চাই না। আমি এই মুহূর্তে তাঁর কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু ॥ তিনি বললেন—

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তিনি যা বললেন, নিজে এসে বলবেন। আজ এই মুহূর্তে স্থির হয়ে যাক্ যে মগধের মহারাজ চাণক্য, না চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রকেতু ॥ অধীর হয়ো না। শোন—

চন্দ্রগুপ্ত ॥ চন্দ্রকেতু! তুমিও আমার অবাধ্য! যাও!

(চন্দ্রকেতু ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ ব্রাহ্মণের দম্ভ আমার ধৈর্যের শিখর ছাড়িয়ে উঠেছে। স্পর্ধা—আশ্চর্য!—না আগে কৈফিয়ৎ শুনবো। অবিচার কর্ব না।

(পরিক্রমণ)

(চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

চাণক্য ॥ মহারাজের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ (শুষ্ক প্রণাম করিয়া) মন্ত্রিবর! আমি আজ আমার নগরে প্রবেশ উপলক্ষে নগরী আলোকিত কর্বার আজ্ঞা দিয়েছিলাম। সে আজ্ঞা পালিত হয়নি কেন?

চাণক্য ॥ আমি নিষেধ করেছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) এর কারণ জানতে পারি কি?

চাণক্য ॥ প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ প্রয়োজন নাই!

চাণক্য ॥ আমি যা করেছি, উচিত বিবেচনা ক'রেই করেছি।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তবু আমি কারণ জানতে চাই।

চাণক্য ॥ কারণ ব্যক্ত কর্বার সময় হয় নি। যখন হবে, বিবৃত কর্ব।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ মন্ত্রী! মগধের মহারাজ আমি।

(চাণক্য সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ মন্ত্রী! আমি ও ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ব না। এর বিচার কর্ব।

চাণক্য ॥ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি উত্তেজিত হয়েছো—প্রকৃতিস্থ হও।

(প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ মন্ত্রী!

(চাণক্য ফিরিলেন)

চাণক্য ॥ বৎস?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ আমি জানতে চাই যে, এ রাজ্যের রাজা আমি না চাণক্য?

চাণক্য ॥ মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কৈ! তা ত দেখছি না। দেখছি যে নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী, নিজের গৃহে আমি ভৃত্য! মন্ত্রী চাণক্য পাটলিপুত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রাজভোগ খাবেন, আর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাই দেশ-দেশান্তর থেকে আহরণ ক'রে এনে দেবে! ভারতবর্ষ মন্ত্রী চাণক্যের গুণগান গাইবে, আর সে গীতের উপাদান যোগাবে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যের আদেশ অবনত শিরে বহন কর্বে আর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় পদাঘাত কর্বেন। এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভালো।

চাণক্য ॥ মহারাজের অভিরুচি। চাণক্য যেচে এ মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে নাই। এই মুহূর্তে আমি অবসর গ্রহণ করছি।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তার পূর্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

চাণক্য ॥ আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ এতদূর!—সৈনিকগণ! বন্দী কর।

(সৈনিকগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ সৈনিকগণ!

[সৈনিকগণ অগ্রসর হইলে চাণক্য অতি প্রশান্তভাবে হস্তের সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।]

চাণক্য ॥ শূদ্রের এতদূর স্পর্ধা এখনও হয় নাই।—মহারাজ! এই আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্লাম। (মন্ত্রীর প্রহরণ রাখিলেন)— মহারাজ! চাণক্য নিশ্চিন্ত বিলাসে রাজধানীতে ব'সে নাই। সে এইখানে ব'সে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর চাণক্যের রাজভোগ!—সে আহার করে দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল, শয়ন করে— অজিনশয্যায়। সে রাজ্যের চিন্তায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে উষ্ণ মস্তিষ্কে কুটির-প্রাঙ্গণে পাদচারণ করে। আমি চললাম।—তোমার রাজ্য তুমি শাসন কর। (প্রস্থানোদ্যত; সহসা ফিরিয়া) হাঁ, যাবার আগে ব'লে যাই, কেন আজ উৎসব নিবারণ করেছিলাম। ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বিদ্রোহ-মন্ত্রণাকে উত্তাপ দিয়ে প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ রাত্রে উৎসবকালে তার দলস্থ লোক নগরী আক্রমণ করবে মনস্থ করেছে। তারা তোমার শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে তোমাকে হত্যা করবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। আমি সৈনিক পাঠিয়েছি তাদের বধ করতে। (প্রস্থানোদ্যত; পুনরায় ফিরিয়া) হাঁ, আরও এক কথা—বিজয়ী সেলুকস সিন্ধুনদ পার হয়েছে। শত্রু চারিদিকে সশস্ত্র; এখন উৎসবের সময় নয়। এইজন্য আমি আপাততঃ উৎসব স্থগিত রেখেছিলাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রকেতু ॥ (তাঁহার পদতলে পড়িয়া) মার্জনা করুন, গুরুদেব।

চাণক্য ॥ কৈফিয়ৎ দেবার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।

(প্রস্থান)

চন্দ্রকেতু ॥ মন্ত্রীকে অনুনয় করে ফেরাও বন্ধুবর।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কেন! যেখানে চাণক্য নাই সেখানে কি রাজ্য চলে না!

চন্দ্রকেতু ॥ কিন্তু তুমি ত তাঁর কাছে এই সিংহাসনের জন্য ঋণী?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ ঋণী! যাক্, অপ্রিয়বাক্য তুমি বলতে বেশ পটু জানি।

চন্দ্রকেতু ॥ অপ্রিয় সত্যকথা বলবার অধিকার এক বন্ধুরই আছে।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কিন্তু সে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।

[চন্দ্রকেতু কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চোখে কহিলেন।]

চন্দ্রকেতু ॥ আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন মহারাজ। ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের বন্ধুত্বের স্পর্ধা কর্ব না। আজ আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি মহারাজ। তবে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে যাই। মহারাজ! সম্পদে আমার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করুন, কিন্তু বিপদে যেন আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। আমার জীবন দিয়েও যদি মহারাজের কোন যৎসামান্য লাভ হয় ত, সে জীবন আমি চিরদিন হাস্যমুখে মহারাজের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত।

[চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন। চন্দ্রগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিল। একজনের হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। সে মুণ্ডটি চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইয়া কহিল।]

সৈনিক ॥ মহারাজ! এই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কোন্ দলপতি?

সৈনিক ॥ পঁচিশ জন ঘাতক মহারাজের শয়ন-ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল। মন্ত্রী মহাশয় তাদের বধ কর্বার জন্য আমাদের সেখানে পাঠান। আমরা সেই পঁচিশ জনকে বেষ্টন করে বধ করে এসেছি মহারাজ! এ সেই দলপতির মুণ্ড!

চন্দ্রগুপ্ত ॥ (মুণ্ড দেখিয়া) একি! এ ত নন্দের শ্যালক—বাচাল। আচ্ছা যাও। (সৈনিকগণের প্রস্থান)

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তাই ত?

(একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ মহারাজের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কি সংবাদ?

সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ বিদ্রোহীরা রাত্রির অন্ধকারে নগর আক্রমণ করতে এসেছিল। আমাদের সতর্ক ও সশস্ত্র দেখে গোপনেই ফিরে যাচ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কে তোমাদের সতর্ক থাকতে বলেছিল?

সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ মন্ত্রীপ্রবর চাণক্য।

[চন্দ্রগুপ্ত একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পূর্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।]

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষা।"—উক্তিটি কাহার? চন্দ্রগুপ্ত কে? ব্রাহ্মণ কে? কোন্ প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত বাক্যটি? বক্তার এই মন্তব্য কতদূর সত্য?

২। "হ্যাঁ, যাবার আগে ব'লে যাই, কেন আজ উৎসব নিবারণ করেছিলাম।"—বক্তা কে? কাহার উদ্দেশে তাঁহার এই উক্তি? 'যাবার আগে' বলিতে বক্তা কি বুঝাইয়াছেন? কিসের উৎসব হইবার কথা ছিল? বক্তা কেন তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন?

৩। "এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভালো।" - এখানে 'আমাদের' বলিতে কাহাদের বুঝানো হইয়াছে? তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধের কথা বক্তা উল্লেখ করিয়াছেন? উক্ত সম্বন্ধ সম্পর্কে বক্তার ধারণা কতদূর সত্য?

৪। "ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের বন্ধুত্বের স্পর্ধা কর্ব না।" এখানে 'আমি' কে? 'মহারাজ'ই বা কে? বক্তা কেন তাঁহার 'বন্ধুত্বের স্পর্ধা' আর করিবেন না? প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি বিবৃত কর।

৫। 'বিজয়োৎসব' নাট্যাংশের কাহিনী বর্ণনা কর।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখ ঃ সস্মিত, প্রহরণ, তণ্ডুল, অজিন, নিনাদিত, পাদচারণ।

২। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখ ঃ বিজয়গৌরব, অবিচার, বাদ্যধ্বনি, অবাধ্য, রাজভোগ, প্রস্থানোদ্যত, সৈন্যাধ্যক্ষ।

৩। অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ ইর্ষা, রুক্ষ, ব্যাক্ত, মুহুর্ত, প্রহরন।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর ঃ পূর্বের জন্ম, সিন্ধু নামক নদ, মনে স্থিত যাহা, পদের দ্বারা আঘাত, মহান্ যে রাজ।

৫। পদান্তর সাধন কর ঃ বিজয়, প্রবেশ, আলিঙ্গন, আদেশ, বঞ্চিত, নিষেধ, অনুমিত, দম্ভ, ধৈর্য, বিবেচনা, ঔদ্ধত্য, সম্বন্ধ, ছিন্ন, মন্ত্রিত্ব, সতর্ক।

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। 'বিজয়োৎসব' নামটি তোমার কেমন লাগে? আলোচ্য নাট্যাংশটির নতুন একটি নামকরণ কর। কেন এমন নাম দিলে যুক্তিদ্বারা বুঝাও।

২। পাটলিপুত্র, মগধ কোথায় অবস্থিত ছিল? ঐ শহর দুইটির বর্তমান নাম কি?

৩ চাণক্যের উপাধি কি ছিল? চাণক্যের লেখা একটি গ্রন্থের নাম কর।

৪। মুরা কে ছিলেন? তাঁহার নামের সঙ্গে মৌর্য বংশের কি সম্বন্ধ আছে?

৫। 'চন্দ্রকেতু' চরিত্রটি তোমার কেমন লাগে—পাঁচ-ছয়টি বাক্যে বুঝাইয়া বল।

৬। নাট্যাংশটির পরিণতির সময় চন্দ্রগুপ্তের অবস্থা কেমন হইয়াছিল? তুমি কি তখন তাঁহার জন্য সমবেদনা অনুভব করিয়াছিলে?

ভারতের দান

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলাদেশের মনীষীদের অন্যতম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্ব এবং দুঃসাধ্য মৌলিক গবেষণালব্ধ ফল দেশে-বিদেশে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি মনে করিতেন কর্ম, শ্রম এবং বাণিজ্যই ব্যক্তি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে। অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—উক্ত স্বদেশানুরাগের পরিচয় আলোচ্য 'ভারতের দান' প্রবন্ধে লভ্য। প্রাচীন ভারত রসায়নচর্চায় উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল এবং এই ভারত হইতেই আরবীয় মারফত উক্ত জ্ঞানাবলী বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—এই তথ্যই লেখক এই প্রবন্ধে যুক্তিসহকারে সুললিত গদ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।]

পাশ্চাত্ত্যদেশে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রচারে আরবীয়গণের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। অতিদূর অতীতে ইয়োরোপখণ্ডে যখন জ্ঞানের আলোক ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রীক সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু যখন মুষ্টিমেয় সাধুসন্ন্যাসীর অপরিসর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রাচ্যের বহুবিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ লইয়া আরবীয়গণ তখন ইয়োরোপের গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। এই-ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইয়োরোপের বর্তমান অগ্রগতির বীজ আরবীয়গণের সাহায্যে উপ্ত হইল।

এখন এই আরবীয়গণ কিভাবে ভারতের নিকট ঋণী তাহা আলোচনা করা যাউক। আবুল ফরজ মহম্মদ-বিন্‌-ইশাক দশম শতাব্দীতে রচিত তদীয় কিতাব-অল্‌-ফিরিস্ত্‌ গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, খলিফা হারুণ ও মনসুরের আদেশে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান ও ঔষধিতত্ত্ব সম্পর্কিত বহু প্রামাণিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ইবন আবু উসাইবিয়া এবং হাজী খলিফার রচনাবলী হইতেও দশম শতাব্দীর মহম্মদ-বিন্‌-ইশাকের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়।

মঙ্খ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক খলিফা হারুণ-অল-

রশিদের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। খলিফার প্রেরণা এবং উৎসাহে তিনি আরবী ভাষায় সুশ্রুতের অনুবাদ এবং ভারতে ব্যবহৃত বনৌষধিসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেন। আরবী ভাষায় চরকের অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাজী খলিফা অনেক স্থলে প্রশংসামুখর হইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবীয় ছাত্রসমাজ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিত। বহু হিন্দু পণ্ডিত খলিফাগণের আমন্ত্রণে বাগদাদে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ হিন্দু পণ্ডিতগণ-পরিচালিত ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে দলে দলে সমবেত হইতেন। বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষে গিয়া বিজ্ঞানচর্চা না হইলে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত না।

খলিফাগণের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায়ই যে মুসলমান ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা নহে, তাহারও বহু বৎসর পূর্বে (৫৩১ হইতে ৫৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেও) বাগদাদ হইতে বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু আরবীয় ছাত্র ভারতে আসিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আলবেরুনি ১০১৭ হইতে ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করেন। আলবেরুনির প্রভু গজনীপতি সুলতান মামুদ যখন থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ ও সোমনাথের মন্দির নির্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া ভারতময় বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছিলেন তখন এই জ্ঞানলিপ্সু মুসলমান ছাত্রটি তাঁহার হিন্দু অধ্যাপকবৃন্দের পদতলে বসিয়া সাংখ্য ও পাতঞ্জলের প্রখ্যাত গ্রন্থপাঠে আত্মহারা

হইতেছিলেন। আলবেরুনির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রসিদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগার হইতে আলি-বিন-জৈন অনূদিত একখণ্ড চরক-সংহিতা পাওয়া যায়। শিক্ষিত আরব অভিজাতের গৃহে চরক-সংহিতার এই সমাদর দেখিয়া বোঝা যায় মুসলমানগণ হিন্দু চিকিৎসা-পদ্ধতিকে কিরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই সময় গজনীতে গ্রীক চিকিৎসা-পদ্ধতিও প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং গ্রীক ও ভারতীয় উভয় পদ্ধতিই পাশাপাশি সমান আদরের সহিত অনুসৃত হইত।

আরবী ভাষায় চরক, সুশ্রুত, নিদান ও অষ্টাঙ্গের অনুবাদসমূহের নাম যথাক্রমে সরক, সুশ্রুত, বিদান এবং অশাঙ্কর দেওয়া হইয়াছে। ভাষান্তরের সময় নামের এইরূপ বিকৃতি ঘটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একথা ভুলিলে চলিবে না। বস্তুতঃপক্ষে পৃথিবীর রাসায়নিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুগণের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকবর্গের অনেকেই আরবীয়গণকে রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল ব্রতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয়গণের নিকট আরবীয়গণের ঋণ তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আরব হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলেই বোঝা যাইবে সভ্য জগতে প্রাচীন ভারতের স্থান কোথায় ছিল। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই গড়িয়া উঠে, সুতরাং যাহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্য ভারতীয় গ্রন্থসমূহকে এত সম্মান করিয়াছেন, তাঁহারা যে রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠও হিন্দু রাসায়নিকগণের নিকট লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

—প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এই আরবীয়গণ কিভাবে ভারতের নিকট ঋণী তাহা আলোচনা করা যাউক"—আলোচ্য অংশটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? কে এই আলোচনা করিতেছেন? আরবীয়গণ যে ভারতীয়গণের নিকট ঋণী লেখক তাহা কি ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন?

২। "বস্তুতঃপক্ষে পৃথিবীর রাসায়নিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুগণের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নাই"—লেখকের এই মর্মপীড়ার কারণ কি? তাঁহার এই মন্তব্যের পশ্চাতে কি কি যুক্তি আছে?

৩। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) 'কিতাব-অল্-ফিরিস্ত্' গ্রন্থটি কাহার লেখা? ইহাতে কি লিখিত আছে বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন? উহার সমর্থন কোথা হইতে পাওয়া যায়?

(খ) মঙ্খ কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

(গ) হাজী খলিফা কে ছিলেন? ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসাসূচক মন্তব্যগুলি লিখ।

(ঘ) আলবেরুনির পরিচয় দাও। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে পাওয়া কোন্ পুস্তকটির কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন? উহা হইতে লেখক কি ধারণা করিয়াছেন?

(ঙ) চরক, সুশ্রুত, নিদান ও অষ্টাঙ্গ সম্বন্ধে কি জান? উক্ত পুস্তকগুলির আরবীয় নাম কি কি? নামের এই পরিবর্তনের কারণ কি?

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: চরক-সংহিতা, সাংখ্য, পাতঞ্জল।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখিয়া বাক্যরচনা কর: সর্বজনস্বীকৃত, মুষ্টিমেয়, প্রকোষ্ঠ, বনৌষধি, জ্ঞানলিপ্সু, পরিপূরক।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: সন্ন্যাসী, সম্মান, জনৈক।

৩। সমাস নির্ণয় কর; ব্যাসবাক্যও লিখিতে হইবে:
অঙ্কশাস্ত্র, সাধুসন্ন্যাসী, গৃহদ্বারে, প্রশংসামুখর, রসায়নবিজ্ঞান, জ্ঞানবিজ্ঞান, ত্রয়োদশ, শতাব্দী।

৪। শুদ্ধ বানান লেখ: অনুদিত, সন্নাসী, সন্মান, বিভিষিকা।

৫। পদান্তর সাধন কর: স্বীকৃত, ঋণী, আদেশ, রাজকীয়, অনুবাদ, আগ্রহ, সঞ্চার, প্রসার, উপলব্ধি, রাসায়নিক।

৬। স্থূলকায় শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: (ক) অপরিসর **প্রকোষ্ঠে**, (খ) **জ্ঞানবিজ্ঞানে** ইউরোপের, (গ) **প্রমাণ** পাওয়া গিয়াছে।

৭। প্রত্যয় নির্ধারণ কর: বিজ্ঞান, অবদান, তদীয়, বিদ্যমান, নিযুক্ত, বৈজ্ঞানিক, লুণ্ঠন, পাতঞ্জল, অনূদিত, দৃষ্টি।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) একটি অক্ষর দ্বারা: আর — য়, স — সী, প্র — সা, সম্পূ —, লুণ্ঠ —, স ন, ভা — ন্তর, নি — চার।

(খ) একটি শব্দ দ্বারা: হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান, — এবং — আরবীয় ছাত্র-সমাজ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিত।

(গ) আলবেরুনি — হইতে — খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করেন। আরবী ভাষায় চরক, সুশ্রুত, নিদান ও অষ্টাঙ্গের অনুবাদসমূহের নাম যথাক্রমে —, —, — এবং — দেওয়া হইয়াছে।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। (ক) এমন তিনজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম কর, যাঁহারা বিশ্ববিখ্যাত। তাঁহাদের মধ্যে কাহারা লেখক রূপেও খ্যাতিমান্?

(খ) প্রফুল্লচন্দ্রের নামের পূর্বে আমরা কী 'বিশেষণ' ব্যবহার করি? শব্দটির অর্থ কি?

২। (ক) আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ হিন্দু-পণ্ডিত-পরিচালিত ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন সমবেত হইতেন?

(খ) সুলতান মামুদ যখন ভারতে মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করিতেছিলেন, সেই সময় একজন জ্ঞানলিপ্সু মুসলমান ছাত্র ভারতে আসেন। তাঁহার নাম কি? তিনি কতদিন ভারতে ছিলেন?

(গ) মহম্মদ বিন্-ইশাক এবং হাজী খলিফা কোন্ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন?

৩। বর্তমান ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগতে কোথায়? এ সম্বন্ধে কিছু বল।



[অতুলচন্দ্র গুপ্ত বর্তমান যুগের একজন চিন্তাশীল মনীষীরূপে খ্যাত। তাঁহার জন্ম ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৯৬১ খ্রী.। অতুলচন্দ্রের রচনা পরিমাণে স্বল্প হইলেও, উহার মধ্য হইতেই তাঁহার মনন, উপলব্ধি এবং পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। আলোচ্য "স্রোতের উজানে—ব্রহ্মপুত্রে" রচনাটি মূলতঃ কয়েকটি চিঠির সংকলন। এখানে একদিকে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন্ত বর্ণনা এবং অন্যদিকে যাত্রাপথের তথ্যসমৃদ্ধ ভৌগোলিক বিবরণে সমৃদ্ধ হইয়া রচনাটি রসগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যিক অথচ অতি ঋজু, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দপ্রবাহী চলিত গদ্য রচনাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে।]

[১]

বেলা একটায় চিলমারি এলুম। চিলমারি থেকেই গারো-পাহাড়ের সারা আকাশের সীমান্তে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। চিলমারি থেকে অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্রের অন্য পারে রৌমারি স্টেশন। সেখানে পৌঁছতে হল ফ্ল্যাটখানি খুলে রেখে দুই চরের মাঝ দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ধারায় অনেক দূর উজিয়ে গিয়ে। এখানে ওখানে তার মধ্যে বহু নীচু কাঁচি চর। নদীর কালো জল ও চরের শুভ্র বালু পাশাপাশি অপরাহ্নের রৌদ্রে অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করেছে। একটু দূরে একটা চর প্রায় ঢেকে চখাচখির ঝাঁক বসেছে। তাদের ধূসর চঞ্চল পাখায় চরটি যেন কাঁপছে, মনে হয় পদ্মের পাতায় ঢাকা পদ্মবন।

শনিবার ভোর সাতটায় ধুবড়ি আসা গেল। ধুবড়ি গোয়ালপাড়া জেলার হেড কোয়ার্টার্স এবং ষ্টীমার-লাইনের একটা অংশের হেড আপিস। নদীর ধারে ধারে ছোটখাটো সুন্দর শহরটি। বছর কয়েক পূর্বে এক মোকদ্দমায় ধুবড়ি এসে অনেক দিন ছিলুম। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের উপরে যে রাস্তা দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াতে যেতুম সে রাস্তার ধারে ফরেস্ট আপিসের দোতলা টিনের বাংলো। নদীর খাড়া পাড়ের উপর তিন দিক জলে ঘেরা, বেশ কবিত্বপূর্ণ কিন্তু একটু আশঙ্কাজনক অবস্থিতির।

ধুবড়ি ছাড়ার পর থেকে নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সার দেখতে দেখতে এসেছি। ব্রহ্মপুত্রের মত প্রকাণ্ড নদীর মাঝ থেকে দুই তীরে এমন পাহাড়ের দৃশ্য পৃথিবীতে নাকি খুব কম দেখা যায়। গাছ-গুল্মে ঢাকা কৃষ্ণাভ সবুজ সব পাহাড়। নন্-কো-অপারেশনের সময় গান্ধীজী যখন আসামে এসেছিলেন তখন এক অভিনন্দনের উত্তরে আসামবাসীদের বলেছিলেন, Your bewitchingly beautiful country'—জাদুকরী সৌন্দর্যের দেশ তোমাদের। ব্রহ্মপুত্র ও তার দুই কূলে নীল পাহাড়ের এই সার দেখলে এ বর্ণনার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

বিকাল তিনটেয় ষ্টীমার বিলাসীপাড়া এল। শীতের ব্রহ্মপুত্র নিস্তরঙ্গ, মনে হয় যেন স্থির। কেবল পূর্ব বাংলার ধানক্ষেতের দিকে দ্রুত-ধাবমান কচুরি-পানার ছোট-বড় ঝাড় তার অন্তরের গতিবেগ জানান দিচ্ছে। এই জলের উপর রৌদ্রের খেলা ও ষ্টীমারের সামনের ডেকের ছাদে তার আলোছায়ার কাঁপন-লীলা সারা দুপুর দেখতে দেখতে এসেছি। বিলাসীপাড়ার স্টেশন ফ্ল্যাটের ঠিক পিছনেই এক সার পাহাড়, এবং বিলাসীপাড়ার পর অনেক পাহাড় নদীর বেশ কাছাকাছি। একটা তিন-চূড়াওয়ালা পাহাড়ের দিকে আমাদের

স্টীমার এগিয়ে চলেছে। নদীর জলে তার অকম্পিত ছায়া বহুক্ষণ ধরে দেখছি, যেন কোনো মন্দিরের ছায়া।

স্টীমারের পিছনে সূর্যাস্ত হল। পশ্চিম আকাশের সোনার রং নদীর একদিকে জল রাঙিয়ে রাখল অনেকক্ষণ।

রাত আটটায় স্টীমার গোয়ালপাড়া পৌঁছল।

[২]

আজ রবিবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ, নদীর উপর কুয়াশা এবং প্রচণ্ড শীত, সমস্ত দিন সূর্যের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কেবল দুপুরবেলার কাছাকাছি দু-চার মিনিটের জন্য এক ঝলক রোদ, আর বিকালে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশের কালো মেঘে গলানো সোনার একটা চওড়া রেখা।

নদী ও তার পাড়ের দৃশ্যও বদলে গেছে। পাহাড় বড় চোখে পড়ছে না। নদীতে নৌকা বিরল এবং দক্ষিণের যে উঁচু পাড়ের কাছ ঘেঁষে প্রায় সারা দিন স্টীমার চলেছে তাতে লোকালয় খুব কম। কেমন একরকম শুকনো চেহারার লম্বা ঘাস সে পাড়ের উপর। আকাশের ধূসর মেঘে ঢেউশূন্য ঘোলাটে নদী। মনটা দমে গেল, সারা দুপুর একটা মাত্র জানালা খোলা রেখে কেবিনে শুয়ে শুয়ে জে. বি. প্রিস্টলির একটা উপন্যাস পড়ছি, ব্রহ্মপুত্রের উপর আর তেমন করে মন বসছে না।

বিকাল চারটেয় পলাশবাড়ি স্টেশন এল। পাড়ে অনেকগুলি বড় নৌকা বাঁধা। তার উপর কমলালেবু, ডিম ও পায়রা বিক্রি হচ্ছে। পলাশবাড়ি থেকে আবার উত্তর দিকে পাহাড়ের সার দেখা দিল; এবং ঘণ্টাখানেক পর পলাশবাড়ি ছাড়লে এক পশলা অল্প বৃষ্টি হয়ে ভাঙ্গা মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদের দেখা পাওয়া গেল। আজ বোধ

হয় পূর্ণিমা। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোতে তীরের পাহাড় ও নদীতে তার ছায়া কেমন একটু অবাস্তব মনে হচ্ছে।

সাড়ে ছটার মধ্যেই স্টীমার পাণ্ডুঘাট এসে পৌঁছেছে। শিলং যাত্রীদের পরাপারের স্টীমার অনেক আলো জ্বালিয়ে ঘাটে লেগে আছে। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এখনও পাণ্ডুঘাটেই আছি। সামনে গৌহাটি শহরের আলো দেখা যাচ্ছে।

কাল সমস্ত রাত স্টীমার পাণ্ডুঘাটেই নোঙর করে ছিল। আজ ভোর ছ-টায় সেখান থেকে রওনা হল। স্টীমার ছাড়ার শব্দ পেয়ে ওভারকোট চাপিয়ে সামনের ডেকে এলুম। গৌহাটি ও শিলং-যাত্রাপথের অল্পবিস্তর পরিচিত পাহাড়-নদী দুধারে; তাদের মাথায় মাথায় কালচে সাদা মেঘের মত কুয়াশা জমে আছে। স্টীমার উমানন্দ ভৈরবের কাছ দিয়ে গেল।

ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে গ্রানাইট পাথরে ধার-বাঁধানো উঁচু ভিতের উপর বড় বড় গাছের ঘন বন, তার মধ্য দিয়ে ভৈরবের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। গৌহাটি শহরের তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি, নদীর ধারের রাস্তায় লোক চলাচল নেই। শহরের একদিকটার প্রায় সমস্ত দৈর্ঘ্য উজিয়ে গৌহাটির বাজার-ঘাটে স্টীমার লাগল। বেলা তখন সাতটা। গৌহাটি শহর কামরূপ জেলার সদর; অসমীয়াদের রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার কেন্দ্র। প্রাচীন পুঁথিপত্রে ও শিলালেখ-তাম্রশাসনে গৌহাটির নাম দেখা যায় গুবাকহট্ট, বোধ হয় গোরুর হাট নয়, সুপারির হাট।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। স্টীমার থেকে মাল নামছে বিস্তর। ডাকহাঁকে জানছি গৌহাটি ও শিলং দু-জায়গার মাল নামছে, আর তাদের তফাত করে রাখা হচ্ছে। ক্রমে বাজার-ঘাটে ধোপাদের কাপড় কাচা শুরু হল। একটা ছোট ফ্ল্যাটের সামনে বসে একটি

খালাসি খুব মনোযোগ দিয়ে একটা নীল কোর্তায় সাবান ঘষছে। রাস্তা দিয়ে দু'খানা মোটর গাড়ি চলে গেল। আজ পাঁচ দিনের পর মোটর গাড়ি দেখে মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল। নাগরিক জীবনের অভ্যাসের এমনি ফল।

[৩]

গৌহাটি থেকে রওনা হতে বেলা বাজল এগারোটা। বেলা দুটোরও পর পর্যন্ত ডাইনে পাহাড়ের সার চলেছে নদীর প্রায় পাড় ঘেঁষে। নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়; হঠাৎ মাঝে মাঝে এক একটা পাহাড়ের খানিকটা অনাবৃত কালো পাথরে মোড়া। প্রকাণ্ড ঐরাবতের পাশের মতো। এক সার পাহাড়ের পিছনে আর এক সার, তারপর আবার এক সার, দূরে দূরে আরও সব সারের মাথা দেখা যাচ্ছে। অতি পাতলা নীল ওড়নার মত ফিকে নীল কুয়াশায় ঢাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় তার সঙ্গীদের ছেড়ে আড়া-আড়ি সোজা চলে এসেছে জলের মধ্যে, নদীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করতে। উল্‌টো দিকের পাড় একটা চরের জিহ্বা অনেকদূর নদীর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে। এ জায়গাটা স্টীমার পার হল অতি ধীরে ও সাবধানে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নদীর ভেতরে চলে আসা দুঃসাহসী পাহাড়ের রূপটি দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে মোড়া পা, তার উপর পালিশ কালো পাথরের চওড়া বুক খাড়া উঠে গেছে, রুদ্ধদুয়ার মন্দিরের কপাটের মত।

বাঁদিকে পাহাড় সব দূরে দূরে। তৃণলেশহীন উঁচু চর চলেছে মাইলের পর মাইল—ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গলাঞ্ছনা আঁকা। অনুজ্জ্বল রৌদ্রে মনে হচ্ছে যেন চূনারি পাথরে তৈরি। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে রোদকে ঢাকতে পারেনি, শুধু নিষ্প্রভ করেছে।

ডানদিকের পাহাড়ের প্রাচীরটা যখন একটু একঘেয়ে বোধ হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পাহাড় গেল দূরে সরে। পূর্ব-বাংলার শীতের নদীর পরিচিত রূপটি ফুটে উঠল। এখানে-ওখানে ছড়ানো চরের শুভ্র বালু কেটে কালো নীল জলের ধারা, দিক্‌চক্রবালে গাছের ঘন সবুজ রেখা।

বেলা পড়ে আসছে ; কেবিনের সামনে বেতের কুর্সিতে রোদে বসে আছি। সম্মুখে একটা গোল চর, চারদিকে নীল পাহাড় ; যারা ছিল নদীর পাশে, বাঁক ঘুরে মনে হচ্ছে তারা যেন নদীর মাঝ থেকে উঠেছে। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে— রূপালী জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল ; মাঝখানে একটা চোখ-ঝলসানো গোল ফুটো দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে ; নদীতে রংয়ের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন টার্নারের একখানা ছবি।

একটা চরের ওপারে নদীর মধ্যে সূর্য অস্ত গেল ; স্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর সন্ধ্যা নেমে এল। পূর্বে প্রতিপদের সোনালী চাঁদ, পশ্চিম-আকাশে বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে।

ভোরে কেবিন ছেড়ে বাইরে এসেই দেখি, বাঁয়ে তেজপুর শহর দেখা যাচ্ছে। স্টীমার ঘাটে লাগতে দেরি হল না। মালপত্র গুছিয়ে স্টীমারের লোকদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে নীচে নেমে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের চর ভেঙ্গে উপরে উঠে গেলুম শহরে।

—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "মনে হয় পদ্মের পাতায় ঢাকা পদ্মবন।"—কি দেখিয়া কাহার এইরূপ মনে হইল ? কোন্ রচনার অন্তর্গত লাইনটি ? উহা কাহার রচনা ?

২। "নদীর ধারে ধারে ছোটখাটো সুন্দর শহরটি।"—এখানে কোন্ শহরের কথা বলা হইয়াছে? লেখকের চক্ষুতে শহরের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার বর্ণনা দাও।

৩। "Your *bewitchingly* beautiful country"—কে, কি কারণে এতাদৃশ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন? বক্তা কি কারণে ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন? বাঁকা অক্ষরের শব্দটির অর্থ কি?

৪। ব্রহ্মপুত্র কোথায়? শীতের ব্রহ্মপুত্র কেমন? ব্রহ্মপুত্রের গতিবেগের পরিচয় লেখক কেমনভাবে পাইলেন? ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থল হইতে দুই তীরের পাহাড়ের দৃশ্য কেমন দেখায়?

৫। "মনটা দমে গেল।"—কি কারণে কাহার মন দমিয়া গেল? মন দমিয়া যাইবার পর তিনি কেমনভাবে সময় অতিবাহিত করিলেন? সকাল হইতে উপরি-উক্ত মন্তব্য করিবার সময় পর্যন্ত বক্তার কিরূপ কাটিয়াছিল?

৬। পলাশবাড়িতে উপস্থিত হইবার পর লেখকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

৭। গৌহাটি কোথায়? শহরটির নাম কেন এইরূপ হইয়াছে বলিয়া লেখক মনে করেন? গৌহাটি শহরের বর্ণনা দাও।

৮। "নাগরিক জীবনের অভ্যাসের এমনি ফল"—প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। কয়েকটি নাগরিক অভ্যাসের উল্লেখ কর। 'নাগরিক' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কি হইবে?

৯। "ব্রহ্মপুত্রের চর ভেঙ্গে উপরে উঠে গেলুম শহরে।"—লেখক কোন্ শহরে উঠিলেন? তিনি কোন্ যানে করিয়া এই শহরে পৌছিলেন? গৌহাটি হইতে উক্ত শহর পর্যন্ত তাঁহার যাত্রাপথের বর্ণনা দাও।

১০। কোন্ লেখকের কোন্ রচনা হইতে নিম্নোক্ত অংশগুলি উদ্ধৃত, তাহা উল্লেখ কর। তাহার পর প্রতিটি উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া, অংশগুলি বুঝাইয়া দাও:

(ক) নদীর খাড়া পাড়ের……আশঙ্কাজনক অবস্থিতির।
(খ) পাতলা মেঘে ঢাকা……অবাস্তব মনে হচ্ছে।
(গ) সব মিলে মনে হচ্ছে যেন টার্নারের একখানা ছবি।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। পদান্তর সাধন কর: প্রশস্ত, মায়া, অবস্থিতি, পৃথিবী, অভিনন্দন, দৈর্ঘ্য, নিবিড়, স্তব্ধ, কৃষ্ণাভ।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: চখাচখি, পদ্মবন, সকাল সন্ধ্যা, তিনচূড়াওয়ালা, অকম্পিত, রুদ্ধদুয়ার, নীলাম্বরী, কবিত্বপূর্ণ।

৩। অর্থ লিখিয়া বাক্য রচনা কর: অপ্রশস্ত, নিস্তরঙ্গ, জাদুকরী, দ্রুতধাবমান, অনাবৃত, তরঙ্গলাঞ্ছনা, নিস্প্রভ, নীলাম্বরী, বিদায়সম্ভাষণ, দিক্‌চক্রবাল।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর: অপরাহ্ন, অনুজ্জল, নিস্প্রভ, মনযোগ।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাংলায় বর্ণীকরণ কর: Steamer, Station, Non-co-operation, Flat.

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। জে. বি. প্রিস্টলি কে ছিলেন বলিতে পারো? কি প্রসঙ্গে লেখক তাঁহার নাম করিয়াছেন?

২। টার্নার কে? তোমার পড়া কোন্ রচনায় তাঁর নাম পাইয়াছ? ঐ রচনার একটি স্থানে লেখক বলিয়াছেন, "সব মিলে মনে হচ্ছে যেন টার্নারের একখানা ছবি।"—ব্যাপারটা কি, একটু বুঝাইয়া বলো।

৩। তোমার পড়া কোন্ রচনায় গান্ধীজীর উল্লেখ পাইয়াছ? ঐ লেখায় তাঁহার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মন্তব্যটি কি বলিতে পারো? কেন তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন?

৪। 'স্রোতের উজানে—ব্রহ্মপুত্রে' কাহার লেখা? 'উজান' বলিতে কি বোঝ? এই রচনাটি কোন্ জাতীয়? এই রচনায় কয়টি শহরের নাম করা হইয়াছে উল্লেখ কর।

উদ্ভিদের সাড়া

[যে কয়জন বাঙালী বৈজ্ঞানিক বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রগণ্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি 'বেতারবার্তা' আবিষ্কার করিলেও, আবিষ্কারকের সম্মান লাভ করেন মার্কনি। এই ঘটনার পরও দমিত না হইয়া তিনি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই স্বয়ং-উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেন, প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও চেতনা ও প্রতিক্রিয়া আছে। বৃক্ষের উত্তেজনাপ্রবাহ, স্বতঃস্পন্দন, মৃত্যুর সাড়া—সার্থক ও নিখুঁতরূপে নিরূপণ করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানজগতে এক অসামান্য দান। আপন বক্তব্যকে যুক্তিতর্কে অন্বিত করিয়া সহজ সাধু গদ্যের মাধ্যমে লেখক রচনাটিকে অতি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।]

আমাদের কোন অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোন কোন গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়, যেমন লজ্জাবতী লতা। মানুষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে—যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পুড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল ভীষণ তাড়না পাতা অধিককাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য এমন কোন মৃদু তাড়নার ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণ থাকে।

এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার

উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপই হইয়া থাকে। এমন কি, বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সূতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোন ওজন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতে জানিতাম—সফলতা, বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বার বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বার বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। পূর্বের কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত-নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পর বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা

কমিয়া গেল ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও পাঁচ ছয় বৎসর লাগিল। তাহা আমার 'সমতাল' যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। যদি দুই, বিভিন্ন বেহালার তার একই সুরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝঙ্কার দিয়া থাকে। সমতাল যন্ত্রে লেখনী লৌহ-তারে নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত এক সুরে বাঁধা। মনে কর, দুইটি তারই প্রতি সেকেণ্ডে একশত বার কম্পিত হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশতবার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত করিবে। এইরূপে ফলকের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের বাধা দূর হয়। এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মূহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমাণ করে।

—জগদীশচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"—কে এইরূপ প্রমাণ করিয়াছিলেন? তিনি কেমনভাবে ইহা প্রমাণ করিলেন?

২। "এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।"—লেখক কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করিলেন? ঐ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিখ।

৩। "যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল।"—এইরূপ নৈরাশ্যজনক মন্তব্য কে করিয়াছেন? কোন্ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে? বক্তা কি শেষ পর্যন্ত উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন?

৪। "সেই বার বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব।"—আলোচ্যাংশে কোন্ বার বৎসরের কথা বলা হইয়াছে? ঐ 'বার বৎসরের কথা', তোমার ভাষায় বিবৃত কর।

৫। 'সমতাল যন্ত্র' কি? কে কিভাবে উহা আবিষ্কার করেন? এই যন্ত্রের কার্যকারিতা কি?

৬। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) উদ্ভিদের সাড়া লিখিয়া লইবার জন্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথমে কোন্ উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন?

(খ) "যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।"—কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত আলোচ্য উক্তিটি? প্রবন্ধটির রচয়িতা কে? জীবতত্ত্ববিদ্ কাহাদের বলা হয়? 'নূতন কথা'গুলি কি কি?

৭। একটি বাক্যে উত্তর দাও:

(ক) প্রাণের লক্ষণ কি? (খ) পাতায় ভীষণ তাড়না করিলে কি ঘটে? (গ) আমাদের অঙ্গে আঘাত করিলে কি হয়? (ঘ) ক্ষুদ্রপত্র সূতার ভার সহিতে পারে কি? (ঙ) কিভাবে পাতা সাড়া দেয়? (চ) আলো-রেখার ওজন আছে কি?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, লজ্জাবতী, লিপিবদ্ধ, আলো-রেখা, বৃক্ষপত্র, অভাবনীয়, কৃষ্ণলিপিপট।

২। বাক্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যবহার কর: শাপে বর, যারপরনাই।

৩। পদান্তর সাধন কর : অঙ্গ, বিকার, বৈদ্যুতিক, অনুভব, উত্তেজিত, সম্ভাবনা, উপায়, প্রতিবিম্বিত, সাক্ষ্য, বিফলতা, লেখনী, উদ্ভাবন, নির্ণীত, স্পন্দন, দীর্ঘ।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর : প্রমান, প্রাননাশ, জীবতত্ব, সূক্ষ, লেখণী।

৫। (ক) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

বি—র, উ—পন্ন, বৈদ্যু—ক, তাড়—, বন—ড়াল, সূ—, সূ—, মূ—র্ত, নি—ত, পরিমা—। (একটি বর্ণদ্বারা)

(খ) কোন কোন গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়, যেমন——। সফলতা —— উল্টা পিঠ। (একটি শব্দ দ্বারা)

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। (ক) 'উদ্ভিদের সাড়া' প্রবন্ধটি কোন্ ভাষায় লেখা—সাধু, না, চলিত? প্রবন্ধটির ভাষা কেমন? সহজ সাধুভাষা, না, তৎসমশব্দবহুল সাধুভাষা?

(খ) তুমি কি জাতীয় ভাষা পছন্দ কর :

(অ) তৎসমশব্দবহুল সাধুভাষা, (আ) সহজ সাধুভাষা, (ই) কঠিন চলিত ভাষা, (ঈ) নিত্যব্যবহৃত চলিত ভাষা।

২। 'উদ্ভিদের সাড়া' রচনাটি তো প্রবন্ধ, কি বলো? আচ্ছা, কি জাতীয় প্রবন্ধ এটি? বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এমন অন্ততঃ দুইজন লেখকের নাম কর।

৩। (ক) লেখক যাঁহাদের সামনে তাঁর পরীক্ষাটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কি বলে? (খ) লেখক তাঁহার কলমটি প্রথম কিসের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন? (গ) পরে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পাতার স্পন্দন লিপিবদ্ধ করেন? (গ) কাগজের ঘর্ষণের বাধা কিভাবে অনেকটা কমিয়া গেল?

——

স্বদেশী যুগের স্মৃতি

[শিল্পজগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অবনীন্দ্রনাথ। তাঁহার জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৯৫১ খ্রী.। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াও সাহিত্য-শিল্পীরূপেও তাঁহার স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। বৈঠকী গল্পের মেজাজে অবনীন্দ্রনাথ আলোচ্য রচনায় সে-যুগের জীবন্ত চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। সে-যুগের স্বদেশী আন্দোলন, প্রাদেশিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া দেশে যে উন্মাদনা ও ত্যাগের প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, বর্তমান রচনায় তাহা প্রতিফলিত।]

তখন এক সময়ে দেখি হঠাৎ সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারিনে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ? সবাই বলে, 'হুকুম আয়া'। আরে, এই হুকুমই বা কে দিলে, কেন? তা জানে না কেউ, জানে কেবল 'হুকুম আয়া'।

তখন স্বদেশী যুগে এখনকার মতো মারামারি ঝগড়াঝাটি ছিল না। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁতখুঁত করতে লাগল, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না—জুতোর দোকান খোলা, ওসব আবার কেন। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হলো দোকানের সামনে—'স্বদেশী ভাণ্ডার'। ঠিক হল স্বদেশী ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে।

বলু খুব খেটেছিল—নানাদেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী পাওয়া যায়—মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সবকিছু

জোগাড় করেছিল, তার ওই শখ ছিল। পুরোদমে দোকান চলছে। শুধু কি দোকান—জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবাসমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারিদিক থেকে একটা সেল্‌ফ্ স্যাক্‌রিফাইসের ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে—ন্যাশনাল ফণ্ড—টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—'মাতৃভাণ্ডার'। সবাই চাঁদা দিলে—একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে। অনেক সাহেবসুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে 'বন্দেমাতরম্' রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিশের লোক কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে!

ভূমিকম্পের বছর সেটা, নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স হবে। সেখানে রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে—বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। তাই নিয়ে চাঁইদের সঙ্গে বাধল, ওঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয়, সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ইংরেজিতে হবে প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে। প্যাণ্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। লালমোহন ঘোষ এমন ঘোরতর সাহেব, বাংলা কইবেন, এ কেউ বিশ্বাস করতে পারত না—তিনিও শেষে বাংলাতেই উঠে বক্তৃতা করলেন। কী সুন্দর বাংলায় বক্তৃতা করলেন তিনি। যাক, আমাদের তো জয় জয়কার। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।

সেই যুগে আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্নবস্ত্র বরাভয়—এক জাপানী আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে। রবিকাকা গান তৈরি করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে পতাকা ঘাড়ে ক'রে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশী, স্বদেশী ভাব ছাড়া কথা নেই। আমরা নিজেদের সাজসজ্জাও বদলে ফেললুম। এই সাজসজ্জার একটা মজার গল্প বলি শোনো।

তখনকার কালে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ কী রকমের ছিল কল্পনা করতে পারবে না। একদিন সেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজে একটা পার্টি হবে, আমাদেরও নেমন্তন্ন। রবিকাকা বললেন, সব ধুতিচাদরে চলো। পরলুম ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে দিলুম শুঁড়তোলা পাঞ্জাবি চটি। এখন খালি পায়ে কী করে যাই। চেয়ে দেখি রবিকাকার পায়ে মোজা, আমরাও চটপট মোজা পরে নিলুম। যাক, মোজা পরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা, সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা। সেজেগুজে রওনা হলাম, কিছুদূর গেছি, দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক-এক টানে দু-পায়ের মোজা খুলে গাড়ির পাদানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমরাও তাই করলুম। পার্টি বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় আমরা কয় মূর্তি গিয়ে উপস্থিত। আমাদের সাজসজ্জা দেখে সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, কেউ আর কথা কয় না। পরে শুনেছি ওঁরা নাকি খুব চটে গিয়েছিলেন, বলেছেন, এ কী রকম অসভ্যতা, লেডিজদের সামনে দেশী সাজে আসা, তার উপর খালি পায়ে, মোজা পর্যন্ত না। সেই যে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল, তা আর ঘুচল না। ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল কংগ্রেস থেকে।

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা,

বাড়ির গিন্নি থেকে চাকর-বাকর, দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। ছোটো ছোটো গামছা, ধুতি তৈরি ক'রে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত!

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি, পল্লীসমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটে-মজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা রবিকাকা সবাই ছুটলুম। তখন বর্ষাকাল—একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল। এক মুহুরি টাকা গুণে নিলে। অতটুকু টিনের ঘরে ত মিটিং হতে পারে না। ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে। আমি ভাবছি—এই সময়েই যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি! এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি এসে খবর দিলে সত্যিই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই হুড়দাড় করে উঠে পড়লুম।

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র, অনুষ্ঠান সব জোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের আর

বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবুও ছিলেন না, একটা কিছু হলেই মন্ত্র বাতলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথকঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটাসোটা তিল ভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম রাখীবন্ধন উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাতলে দিতে। তিনি খুব খুশি ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখী-বন্ধন উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে।

ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব। সামনেই জগন্নাথ ঘাট, রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে। রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও সঙ্গে ছিল, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকালে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, মুসলমানকে

রাখী পরালেন—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট হবে আর কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে।

আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল, চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। এইবারে বেগতিক—আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছালো, অমনি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম। দীপুদা দারোয়ান, দারোয়ান, যা শিগ্‌গির দেখ্ কি হল—বলে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি—এক কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসল মাত্র।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম'—উক্তিটি কাহার? 'আমরা' বলিতে লেখক কাহাদের বুঝাইয়াছেন? বাংলা ভাষার জন্য তাঁহারা কোথায় কিভাবে লড়িয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দাও।

২। 'সেই যে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল তা আর ঘুচল না।'—ন্যাশনাল ড্রেস কথাটির অর্থ কি? ন্যাশনাল ড্রেস চালু হওয়ার প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি কি?

৩। 'এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল।'—কোন্ গানটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে? কি উপলক্ষে এই গানটি কে রচনা করিয়াছিলেন?

৪।. 'ঠিক হল স্বদেশী ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে'—এখানে কোন্ দোকানের কথা বলা হইয়াছে? দোকানটি কাহাদের উৎসাহে গড়িয়া উঠিয়াছিল? ঐ দোকানে কি কি পাওয়া যাইত? এই দোকান করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?

৫। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও।

(ক) 'তারাও টুপি উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ রব তুলেছিল থেকে থেকে।'—এখানে 'তারা' বলিতে কাহাদের বোঝানো হইয়াছে? কবে কি কারণে তাহারা টুপি উড়াইয়া বন্দেমাতরম্ রব তুলিয়াছিল?

(খ) 'একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে।'—কাহার সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি? কোন্‌দিন কাহাকে সে সব রোজগার দিয়াছিল?

(গ) 'এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে।' এ কথা কে বলিয়াছিলেন? তিনি পাঁজিতে কী তুলিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন?

(ঘ) 'এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম।'—দীপুদা কে? তাঁহাকে কি খবর দেওয়া হইল? তিনি খবর শুনিয়া কি করিলেন?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। (ক) স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর:—সাজসজ্জা, স্বদেশী, বরাভয়, শোভাযাত্রা, লোকারণ্য।

(খ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর:— মাতৃভাণ্ডার, নিশ্চিন্ত, সেবাসমিতি, মালগাড়ি, লোকারণ্য, রাখীবন্ধন, মুটেমজুর, অন্নবস্ত্র, কোলাকুলি।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি' কার রচনা? রচয়িতার রচিত আরও দুটি বইয়ের নাম বল।

২। রবিকাকা, বলু, দিনু, সুরেন—এঁদের পরিচয় দাও।

৩। রাখীবন্ধনের দিনে কোন্ গানটি গাওয়া হয়েছিল? গানটির পর পর দুই ছত্র বল।

৪। রামকেষ্টপুরে কুলিদের সভার বর্ণনা দাও।

৫। ন্যাশনাল ড্রেস বলতে লেখক কোন্ পোশাকের কথা বলেছিলেন?

৬। এই রচনায় লেখক একটা শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। তোমার ভাষায় বর্ণনাটা দাও।

সমুদ্রে ঝড়

[শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁহার জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ (মতান্তরে ১৮৭৫); মৃত্যু ১৯৩৮। বাঙালীর গৃহজীবনের কথাকে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রকাশ করিয়া তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর মানবহৃদয়ে স্থান করিয়া লইয়াছেন। আলোচ্য রচনাটি লেখকের শ্রীকান্ত (২য়) উপন্যাসের অংশবিশেষ। লেখকের নিবিড় সংবেদনশীল অনুভূতির যথাযথ রূপায়ণের ফলে রচনাটি হইতে আমরা সমুদ্রবক্ষে ঝড়ের একটি বিস্তৃত ও বাস্তব চিত্র পাই।]

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না, এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধগোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে বলে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও, কাপ্তান কইছে হাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট পনের পরেই দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল, দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে

হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্য ত বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এই-রূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না! ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক।

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখে বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছে। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একবারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপার-উপরি রাখা ছিল। তাহারই উপর উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে

হইল, এই বুঝি সেই ছাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদ মাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণে একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে, এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া সুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার

খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্ বজ্ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান, এই চোখ দুইটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি ; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই, যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এতবড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি! মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই ; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এভাব মনে আসে না ; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে। সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে সেই জ্বলা নানাপ্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা

করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না, এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ডগোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজসুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলো বার কতক ঝট্পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাঁট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল।

মুহূর্তে মনে হইল, শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব

এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি, যে কথা, সেই কাজ, কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম, এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না।'—'কল্যাণ' বলিতে এখানে কি বোঝানো হইয়াছে? লেখকের সেই ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না কেন?

২। 'কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না।'—কি সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি? ইহাকে লেখক কিভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন?

৩। 'তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।' —কিসের অপেক্ষা, কাহাদের আসা, কি কারণে ঢের ভাল ছিল?

৪। ঝড়ের পূর্বে আকাশের চেহারা ও জাহাজের পরিস্থিতি বর্ণনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) 'কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে'— কাহার সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি? লেখক মনে মনে তাহার উদ্দেশে কি বলিয়াছেন?

(খ) 'যাঁহার শুভাগমনের জন্য সেই মহারাজ আসিয়া পড়িলেন।'—কাহার শুভাগমনের কথা বলা হইয়াছে? মহারাজ কিভাবে আসিয়া পড়িলেন? তিনি আসাতে কি প্রতিক্রিয়া হইল?

(গ) ঝড়ের সময় জাহাজের খোলের যাত্রীদের অবস্থা বর্ণনা কর।

॥ পাঠ্যাংশে ব্যাকরণ ॥

১। (ক) অর্থ লিখ: সংঘর্ষ, অনুক্ষণ, অপরিমেয়, আবদ্ধ, বিভূতি, ভবলীলা, রজতশুভ্র, কিরীট, কলেবর, গোষ্পদ।

(খ) বাক্য রচনা কর: অনুভব, মৃত্যুযন্ত্রণা, পদভরে, গভীরকৃষ্ণ, ভাগ্য-দেবতা, দিক্চক্রবাল, স্বমূলক, সুবিপুল, অভিভূত, সমস্বরে।

(গ) শুদ্ধ বানান লেখ: অপরাহ্ন, ব্যাস্ততা, দুরবীণ, অচিন্ত্যনীয়, সামর্থ, সম্মুখ, দূর্গানাম, নিমন্ত্রন, মুহুর্ত, সন্ধা।

(ঘ) পদান্তর কর: উদ্বেগ, মঙ্গল, কল্যাণ, আবির্ভাব, চেতনা, বিপুলত্ব, রাগ।

(ঙ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর: গোষ্পদ, ততোধিক, শুভাগমন, উন্মত্ত।

(চ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর:—সমুদ্রতরঙ্গ, অস্থিমজ্জা, শতকোটি, অনুক্ষণ, বিরাটকায়, রজতশুভ্র, ঢেউ-সম্রাট, গভীরকৃষ্ণ, মহাতরঙ্গ, ঠেলাঠেলি।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'সমুদ্রে ঝড়' কার লেখা? এই নামটি কি লেখক নিজে দিয়েছেন? নামটি তোমার কেমন লাগে? এই রচনার অন্য একটি নাম দাও।

২। 'সমুদ্রে ঝড়' লেখকের কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত? ঐ গ্রন্থটি কয় খণ্ডে সম্পূর্ণ?

৩। 'সমুদ্রে ঝড়'-এর এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া কি হইবে!'—হরবল্লভ কে? প্রসঙ্গটি বলতে পারো?

৪। শরৎচন্দ্রের কোন্ কোন্ লেখা তুমি পড়েছ?



[শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় বাংলাদেশের চল্লিশের দশকের খ্যাতনামা সাংবাদিক। তিনি সেবাগ্রাম আশ্রমে কয়েক বৎসর গান্ধীজীর সান্নিধ্যে বাস করেন। সুভাষচন্দ্র বসু-প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের ইনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। দেশের শিল্প ও অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান্ ইংরেজী গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ভারতীয় লৌহশিল্পের অতীত ও বর্তমান অবস্থার এক বিশ্লেষণী চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।]

বস্ত্রশিল্পের ন্যায় লৌহ-উৎপাদন ছিল ভারতের অন্যতম পুরাতন শিল্প। প্রাচীনকালে ভারতের লৌহ-উৎপাদন এত পর্যাপ্ত ও উন্নত ছিল যে, দেশের সমস্ত চাহিদা মিটিয়েও শত শত বৎসর ধরে তৈরি লৌহ ও লৌহ-সামগ্রী ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। ভারতে উৎপন্ন লৌহের সৌকর্য এত উন্নত ধরনের ছিল যে, তা জগৎব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছিল। অন্ততপক্ষে দেড় হাজার বছর পূর্বের নির্মিত দিল্লীর নিকটস্থ বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ ঢালাই লৌহের এমন একটি অপূর্ব নিদর্শন যে, এর নির্মাণ-কৌশলের রহস্য আধুনিক গবেষকদের কাছে আজও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। তা ছাড়া আসামে বৃহত্তম ব্যাসবিশিষ্ট ঢালাই লোহার চমৎকার কামান তৈরি হত। বিশ্ববিখ্যাত দামাস্কাস তরবারি প্রস্তুত হত ভারতীয় ইস্পাত থেকেই; এই দুর্লভ ইস্পাত সংগ্রহ করে এশিয়া মহাদেশে লাভজনক রপ্তানি বাণিজ্য করতে পারস্যের বণিকেরা সে যুগে ভারতে যাওয়া-আসা করত। অতীতে এককালে ইংলণ্ডে কাঁটা-চামচ, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদির জন্য ভারতীয় ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে আদিম অধিবাসীরা লৌহ নির্মাণের কাজ ত্যাগ করতে থাকে। কারণ পাশ্চাত্য দেশের তৈরি সাধারণ ব্যবসায়ের কাজে উপযোগী সস্তা দামের নিকৃষ্ট ধরনের লোহা ভারতীয় উৎকৃষ্ট লোহার চাহিদা কমিয়ে দিল। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত-কারখানাগুলি ভারতের একটি আদি শিল্পকে বিধ্বস্ত করে দিল। একদিকে বৃহৎ ব্যবসায়ের স্বার্থবুদ্ধি, অন্যদিকে দেশী শিল্পীদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য, এই দুই-এর মিলনে বহু কৃতিত্বময় ভারতীয় লৌহশিল্প সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল।

তারপর দেশীয় বা বিদেশীয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশে যদি বা কোনো লৌহ উৎপাদনের কারখানা শুরু হয়েছে তাও নানা কারণে অঙ্কুরেই বিনাশলাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এবং মাদ্রাজের উপকূলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এ রকম কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। আজকাল তোমরা যে সব কোম্পানির নাম শুনতে পাও,—যেমন জেসপ কোম্পানি, বার্ন কোম্পানি—এরাও তখন বরাকরে, রানীগঞ্জে লোহার কারখানা খুলতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু একটা-না-একটা অসুবিধায় তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১০ সালে মার্টিন কোম্পানি এ কাজে হাত দেওয়ার পরে বিদেশী উদ্যোগে এদেশে ভালো লোহার কারখানা স্থাপিত হল। মার্টিন কোম্পানির সাফল্যের মূল কথা হল —এরা অপেক্ষাকৃত ভালো খনি থেকে আকর-লোহা সংগ্রহ করতে পারল এবং তা ঢালাই করে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় লোহার পাইপ এবং রেলের লাইন প্রভৃতি তৈরি করতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই কোম্পানি প্রচুর লাভ করল এবং যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে নতুন করে এই কোম্পানির সংগঠন করা হল।

কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের লৌহশিল্পের পত্তনে ও প্রসারে

যাঁর নামটি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন স্বর্গীয় জামসেদজী টাটা। দেশপ্রেমিক জামসেদজী টাটা শুধু লৌহশিল্পেই নয়, ভারতে বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প স্থাপনের অগ্রণী পুরুষ। টাটা বহুদিন ধরেই ভাবছিলেন ভারতের ভূগর্ভস্থ বিপুল লৌহসম্পদ্ কি করে বৃহৎ শিল্পাকারে কাজে লাগানো যায়। তাঁর কাপড়ের কল এম্প্রেস্ মিলের কাগজপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর হাতে চন্দা জেলায় লৌহ উৎপাদনের অনুসন্ধান-সংক্রান্ত একটা সরকারী রিপোর্ট এসে পড়ে। এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন সোয়ার্টজ নামে একজন জার্মান ভূতত্ত্ববিদ্। তাঁকে ভারত সরকার ভারতবর্ষের ভূগর্ভের লৌহ ও কয়লাসঞ্চয় অনুসন্ধান করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। রিপোর্টটি পড়ে জামসেদজী টাটা চন্দা জেলায় গিয়ে সেখান থেকে আকর-লোহা নিয়ে ইংলণ্ডে গেলেন—সেখানে একটা সহজ প্রণালীতে ধাতব লোহা গলানোর পরীক্ষাও করলেন। কিন্তু দেশে ফিরে এলে মধ্যপ্রদেশের কমিশনার তাঁকে চন্দা জেলার আকর থেকে লোহা তোলার অনুমতি দিলেন না। কারণ তখনকার দিনে বিদেশী সরকার ভারতের খনিজ পদার্থ দেশীয়দের হাতে পড়ুক বা তারা লৌহ বা ইস্পাতশিল্পের প্রতিষ্ঠা করুক এটা চাইত না।

এরপর জামসেদজী টাটার পুত্র দোরাবজী টাটা দুর্গ জেলায় লৌহের অনুসন্ধান চালাতে অগ্রসর হলেন। দীর্ঘকাল জিয়োলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারী হিসাবে বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু এই এলাকায় সমীক্ষা করেন—কিন্তু তাঁর রিপোর্ট এতদিন ধামাচাপা পড়ে ছিল। এই এলাকাটা টাটাজীরা খুঁজে বের করলেন—দেখা গেল এই স্থানটিতে লোহা জমা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এবং সবই খাঁটি লোহা। কিন্তু কাছাকাছি কয়লা নেই—

অতএব এঁরা মহানদীর তীরবর্তী পদমপুরে কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯০৪ সালে জামসেদজী টাটা পরলোক গমন করেন। একদিন টাটা কোম্পানি একখানি চিঠি পেলেন প্রমথ বসুর কাছ থেকে। প্রমথ বসু তখন সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজ দ্বারা তাঁর রাজ্যে খনিজ-সম্পদ অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রমথ বসু চিঠিতে টাটাদের জানালেন তিনি অগাধ আকর-লোহার সন্ধান পেয়েছেন, টাটা সংস্থা যেন সেই আকরস্থান পরিদর্শন করেন। দোরাবজী টাটা তখন পেরিন প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে ময়ূরভঞ্জে এসে আকরস্থান পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁরা এমন এক রত্নভাণ্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যাতে কাজ করতে পারলে তা সোনার খনির চেয়েও অনেক বেশি লাভজনক হবে। জায়গাটি সমুদ্র থেকে অনেক কাছে এবং কয়লাখনি এলাকার সন্নিহিত।

টাটা কোম্পানি অচিরেই ময়ূরভঞ্জ মহারাজার সঙ্গে একটা চুক্তিনামা সম্পাদন করলেন। তারপর ১৯০৬ সালে দোরাবজী ছুটলেন লণ্ডনে কোম্পানির জন্য টাকা তুলতে। কিন্তু মতপার্থক্য দেখা দিল ইংরেজ লগ্নিকারকদের হাতে কতটা কর্তৃত্ব থাকবে তাই নিয়ে। হাবভাবে বোঝা গেল টাটা-কর্তৃপক্ষকে কর্তৃত্ব থেকে একেবারে হটিয়ে দেওয়াই তাদের ইচ্ছা।

দোরাবজী হতাশ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মের আগেই ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ-এ এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। ভারতীয় প্রচেষ্টাতেই ভারতের সম্পদ্ ও শিল্প গড়ে তোলার আদর্শ-প্রচার পূর্ণোদ্যমে চলল। সারা ভারত তখন স্বদেশীয়ানার কথা বলছে এবং স্বদেশী ব্যবসা-উদ্যোগে

অর্থবিনিয়োগের আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ১৯০৭ সালের ৭ই আগস্ট নতুন কোম্পানির একটি অনুষ্ঠানপত্র বা প্রোস্পেক্টাস প্রকাশ করা হল। সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বোম্বাই-এ টাটা কোম্পানির অফিস লোকে লোকারণ্য—সকলেই ভারতীয়, সকলেই টাকা খাটাতে চায় স্বদেশী উদ্যোগে ; যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, সকলেই এসেছে তাদের যা আছে তাই দিতে। তিন সপ্তাহের মধ্যে কারখানা পত্তনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচা—প্রায় আড়াই কোটি টাকা—সংগ্রহ হয়ে গেল ; এই বিরাট অঙ্কের মূলধনের প্রতিটি পয়সা সংগ্রহ হলো ৮০০০ ভারতীয় লগ্নিকারকের কাছ থেকে। এর পর যখন কারখানার কার্যকরী তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশে অংশীদারদের কাছে টাকা চাওয়া হল তখন তার সমস্ত অঙ্কটাই ৬০ লক্ষ টাকা—একজন ভারতীয় ধনকুবের—গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া মহারাজা একাই দিয়ে দিলেন।

এইভাবে ১৯০৯ সালে জামসেদপুরে টাটা লৌহ-ইস্পাত শিল্প-সংস্থার পত্তন হল। অবশ্য ১৯০৯ সালে কারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ কার্যতঃ আরম্ভ হল, কিন্তু লোহা-ইস্পাত উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয় ১৯১১ সালে। তারপর থেকে নানা সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে, বিদেশী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা-অসহযোগিতার জটিল পথে, আন্তর্জাতিক লোহার বাজারের তেজীমন্দীর সঙ্গে তাল রেখে টাটা লৌহ-ইস্পাত সংস্থা ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করে এসেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের লৌহ-ইস্পাত শিল্পে নতুন করে একটা পুনরুজ্জীবনের যুগ এল। এর আগে একমাত্র টাটা ছাড়া এবং বার্নপুরের ইংরেজ স্থাপিত কারখানায় ভারতীয়দের কিছু-কিছু

অধিকার ছাড়া লৌহ-ইস্পাত শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগ আর কিছু ছিল না। স্বাধীনতার পর এই উদ্যোগ এল স্বয়ং আমাদের দেশী সরকারের দিক থেকে—কারণ লৌহ-ইস্পাত শিল্প দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য এত জরুরী যে, সরকার তা আর বেসরকারী উদ্যোগে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। তা ছাড়া, এসব প্রকল্প এত বিরাট যে, কোন বেসরকারী সংস্থার পক্ষে তা গড়ে তোলাও সহজ নয়। সরকারী উদ্যোগে যে-সব লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হল তার মধ্যে দুর্গাপুরের কারখানা তৈরি হয় ব্রিটিশ সহযোগিতায়, রাউরকেল্লা গড়ে দেয় জার্মান ইঞ্জিনিয়ারেরা আর ভিলাই সোভিয়েত শিল্পীদের দান এবং আধুনিক বোকারো স্টীল প্ল্যাণ্টও সোভিয়েত সহযোগিতায়ই সম্পন্ন হয়েছে। এই কারখানাগুলি স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা লৌহ-ইস্পাত সম্পর্কে বিদেশী কারিগরি বিদ্যা অনেক আয়ত্ত করেছি, এবং এই সংস্থাগুলি এখন আমরা নিজেরাই চালনা করতে পারছি। এখন এগুলিতে যে পরিমাণ লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে তা আমাদের দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ভারতের প্রয়োজনীয় লৌহ-ইস্পাতের অনেকাংশই এই কারখানাগুলি মিটাতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

—শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এই দুই-এর মিলনে বহু কৃতিত্বময় ভারতীয় লৌহশিল্প সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল"—'কৃতিত্বময় ভারতীয় লৌহশিল্পে'র পরিচয় দাও। এখানে কোন্ 'দুই'-এর মিলনের কথা বলা হইয়াছে? কিভাবে উক্ত শিল্প বিনষ্ট হইয়া গেল?

২। "কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের……জামসেদজী টাটা।"—টাটা কে ছিলেন? ভারতের লৌহশিল্পের পত্তন ও প্রসারের সহিত জামসেদজীর কি সম্পর্ক ছিল?

৩। ভারতবর্ষে লৌহ-ইস্পাত শিল্প স্থাপনায় টাটা-পরিবারের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। "স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের লৌহ-ইস্পাত শিল্পে নতুন করে একটা পুনরুজ্জীবনের যুগ এল।"—'পুনরুজ্জীবন' বলিতে কি বুঝ? ঐ পুনরুজ্জীবনের পরিচয় দাও।

৫। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:
"এর নির্মাণ-কৌশলের রহস্য আধুনিক গবেষকদের কাছে আজও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে।"—এখানে কিসের 'নির্মাণ-কৌশলে'র কথা বলা হইয়াছে? 'গবেষক' কাহাদের বলা হয়? কোন্ রহস্য গবেষকদের নিকট আজিও অনুদ্ঘাটিত?

৬। "তখন তার সমস্ত অঙ্কটাই……একজন ভারতীয় ধনকুবের…… একাই দিয়ে দিলেন।"—'ধনকুবের' বলিতে কি বুঝ? এখানে কোন্ ভারতীয় ধনকুবেরের কথা বলা হইয়াছে? 'সমস্ত অঙ্কটা' কত? কেন তাঁহাকে ঐ 'অঙ্কটি' দিতে হইয়াছিল?

৭। "এইভাবে ১৯০৯ সালে জামসেদপুরে টাটা লৌহ-ইস্পাত শিল্প-সংস্থার পত্তন হল।"—কেমনভাবে শিল্প-সংস্থাটির পত্তন হইল, লিখ।

৮। 'স্বদেশী আন্দোলন' ভারতীয় লৌহ-শিল্পের পত্তন, প্রসার এবং পুনরুজ্জীবনে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। শব্দার্থ লেখ: পর্যাপ্ত, সৌকর্য, বিধ্বস্ত, পত্তন, ভূগর্ভস্থ।

২। বাক্য রচনা কর: স্বার্থবুদ্ধি, ঔদাসীন্য, অঙ্কুরেই বিনাশ, অগ্রণী, ভূতত্ত্ববিদ্, ধামাচাপা, সন্নিহিত, হটিয়ে দেওয়া, তেজীমন্দী, অদূর ভবিষ্যতে।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: অনুদ্ঘাটিত, শিল্পাকারে, পূর্ণোদ্যমে, লোকারণ্য, পুনরুজ্জীবন, উদ্যোগ, পর্যাপ্ত, উদ্ভব।

৪। পদান্তর কর: ঔদাসীন্য, লুপ্ত, দেশীয়, হতাশ, সন্দেহ, উৎপাদন, সহযোগিতা, কর্তৃত্ব, সপ্তাহ, উদ্যোগ।

৫। ব্যাসবাক্য লিখিয়া সমাস নির্ণয় কর: জগৎব্যাপী, লৌহস্তম্ভ, বিশ্ববিখ্যাত, বিশ্বযুদ্ধ, খনিজ সম্পদ, বেসরকারী, লৌহ-ইস্পাত।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর : (ক) বিশ্ববিখ্যাত—তরবারি প্রস্তুত হত ভারতীয়—থেকেই। (খ) বাঙালী—প্রমথনাথ বসু এই এলাকায় সমীক্ষা করেন।

৭। সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর : তাঁরা এমন এক রত্নভাণ্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যাতে কাজ করতে পারলে তা সোনার খনির চেয়েও অনেক বেশি লাভজনক হবে।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। ভারতে উৎপন্ন লৌহ-ইস্পাতের সৌকর্য যে উন্নত ধরনের ছিল তাহার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২। ইংলণ্ডে ভারতীয় ইস্পাতের চাহিদা কেন ছিল? এই চাহিদা কিভাবে কমিয়া গেল?

৩। মার্টিন কোম্পানির সাফল্যের মূল কথা কি?

৪। প্রমথ বসু কে? তিনি টাটাদের কিভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন?

৫। ১৯০৭ সালের ৭ই আগস্ট ভারতীয় লৌহ-শিল্পের ইতিহাস স্মরণীয় কেন?

৬। নিম্নলিখিত ইস্পাত কারখানাগুলি কাহাদের সহযোগিতায় তৈয়ারি হইয়াছে?

(ক) দুর্গাপুর, (খ) রাউরকেল্লা, (গ) ভিলাই, (ঘ) বোকারো। ঐ স্থানগুলির কোন্‌টি কোন্ প্রদেশে অবস্থিত বল।



[অভিযান-কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। আলোচ্য রচনায় লেখক সুমেরু অভিযানের ব্যর্থতা-সাফল্য-গৌরবের চিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়াই চলিয়াছে একের পর এক অভিযান। তথ্যপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনাভঙ্গী রচনাটির সৌকর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।]

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত মেরু অঞ্চল বহু সহস্র শতাব্দী যাবৎ মানুষের নিকট রহস্যাবৃত ছিল। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্যকে ভেদ করিবার জন্য দুঃসাহসী মানুষের মনে প্রবল বাসনা জাগরিত হয়। এই বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কত যে অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুতেই আগ্রহ দমিত হইল না, বরং কর্তব্য দুরূহ বলিয়া আকর্ষণ আরও বাড়িয়া গেল।

পৃথিবীতে যে কয়জন অসমসাহসী পুরুষ মেরু অভিযান করিয়াছেন নরওয়ে দেশের অভিযাত্রী ফ্রিৎজপ ন্যানসেন চিরদিন তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিবেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ওসলো নগরীর সন্নিকটে ফ্রোয়েন নামক স্থানে ন্যানসেনের জন্ম হয়। ওসলো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাণিবিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। ছেলেবেলা হইতে ন্যানসেনের সমুদ্রযাত্রার প্রতি অসাধারণ ঝোঁক ছিল। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ন্যানসেন কয়েকজন সঙ্গী লইয়া গ্রীনল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেন।

ছয় মাসকাল তাঁহারা সেখানে থাকিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ন্যানসেন মেরু অভিযানের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। নরওয়ে পার্লামেণ্ট এই অভিযানের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময় বিমান অথবা বেতার আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি কোনরূপ বিপদে পড়েন বহির্জগৎ হইতে তাঁহার কোনই সাহায্য পাওয়ার আশা নাই। ন্যানসেনের ধারণা ছিল যে, বেরিং উপসাগর হইতে একটি স্রোত বরফের ভিতর দিয়া মেরু অভিমুখে প্রবাহিত। যদি তাঁহার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় তবে সমুদ্রের স্রোতের দয়ার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে। নিষ্ঠুর সমুদ্রের খামখেয়ালের ফলে অনেক হতভাগ্য অভিযাত্রীকে ইতিপূর্বে প্রাণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু ন্যানসেনের আত্মপ্রত্যয় ছিল অপরিসীম।

ন্যানসেনের এখন সমস্যা হইল জাহাজ নিয়া। তরল জলের উপর চলন্ত জাহাজ বরফের চাপে মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কাজেই এমন একটি জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে যাহা বরফের ক্রমবর্ধমান চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়। ন্যানসেন নিজের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ ধরনের জাহাজ তৈয়ার করাইলেন। উহার নাম দিলেন তিনি "ফ্রাম" অর্থাৎ ফরওয়ার্ড। "ফ্রামের" উপর ন্যানসেন যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাহা পুরাপুরি সমর্থিত হইয়াছিল। ওসলো পোতাশ্রয়ে "ফ্রাম" এখনও ন্যানসেনের স্মৃতি বহন করিয়া বিরাজিত।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে "ফ্রাম" ১৩জন মরণপণকারী যাত্রী লইয়া মহান কর্তব্য সমাপনের জন্য খ্রীস্টিয়ানা বন্দর হইতে যাত্রা করিল। কারাসাগর অতিক্রম করিয়া সাইবেরিয়ার উপকূল ধরিয়া ন্যানসেন

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ন্যানসেন আবিষ্কার করিলেন। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে "ফ্রাম" ৭৮ ডিগ্রী পর্যন্ত অগ্রসর হইল। মেরু আরও ১২ ডিগ্রী উত্তরে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে "ফ্রাম" ৭৮ ডিগ্রী হইতে ৮২ ডিগ্রী পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র ৪ ডিগ্রী অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। শুধু বরফের রাজ্যে ১৮৯ মাইল অতিক্রান্ত হইল।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। অদ্ভুত নৈপুণ্যে প্রস্তুত "ফ্রাম" বরফের সমস্ত প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও টিকিয়া রহিল। কিন্তু "ফ্রামের" যাত্রীদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠিল। দুঃসহ শারীরিক কষ্টের জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র ভীত নহেন, কিন্তু মৃত্যুর মতো নিঃসঙ্গতা তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। পাখির ডাক, গাড়ির শব্দ অথবা মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিজেদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত তাঁহাদের কাছে অদ্ভুত মনে হইতে লগিল। ন্যানসেন সঙ্গীদের এই কষ্টের কথা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন ; ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ ন্যানসেন এক দুঃসাহসিক কার্য করিয়া বসিলেন। তিনি একশত দিনের মত খাবার লইয়া জোহান্‌সেন নামে একজন মাত্র সঙ্গী লইয়া "ফ্রাম" হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং অন্যান্য সঙ্গীদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন।

একমাস অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে ন্যানসেন ও তাঁহার সঙ্গী ৮৬ ডিগ্রী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আর কোন মেরু-অভিযাত্রীই এ পর্যন্ত অতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ক্রমেই আবহাওয়া শীতল হইতে লাগিল। গলিত বরফ ও কুয়াশায় অগ্রগমন ক্রমশঃই দুরূহ হইতে লাগিল। এ সময়ে জোহান্‌সেন এক ভল্লুকের আক্রমণে

সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার প্রকোপে ন্যানসেনও বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তার উপর আরও এক দারুণ দুর্দৈব উপস্থিত হইল ; হঠাৎ ন্যানসেনের ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গেল, কোনক্রমেই তাহাকে মেরামত করা গেল না। ফলে দ্রাঘিমা গণনা করা অসম্ভবই হইয়া উঠিল।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। ন্যানসেন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সভ্য জগৎ হইতে শত শত মাইল দূরে হিমানী-স্তব্ধ করা তুহিনের আবেষ্টনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহই কোন সংবাদ পাইবে না যে, ন্যানসেন নামক একজন অসমসাহসী মানুষ পৃথিবীর লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য প্রাণবিসর্জন দিয়াছিলেন।

শেষ পর্যন্ত খাদ্য ফুরাইয়া গেল। বরফের রাজ্যে যাহা পাওয়া গেল খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা না করিয়া ন্যানসেন ও জোহান্‌সেন তাহাই খাইয়া কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাস আসিয়া গেল অর্থাৎ এক বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গেল। ন্যানসেন ও জোহান্‌সেন সুকঠিন বাতব্যাধিতে আক্রান্ত। নড়িবার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। দু-এক দিনের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য। এমন সময় হঠাৎ ভগবানের আশীর্বাদ নামিয়া আসিল। ন্যানসেন মানুষের ও কুকুরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

ন্যানসেনের কথা তাঁহার সঙ্গীরা দেশে গিয়া জানাইয়াছিলেন। একশত দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার আরও অনেক দিন পরেও ন্যানসেন যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন বৃটিশ অভিযাত্রী ফ্রেড্‌রিক্ জ্যাক্‌সন্ একদল সঙ্গী লইয়া ন্যানসেনের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘড়ি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ন্যানসেন

দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে স্পিটস্‌বার্গেনের কাছাকাছি একটা স্থানে আসিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখান হইতেই জ্যাক্‌সন তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

১৮৯৬ সালের ১৩ই আগস্ট ন্যানসেন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র নরওয়েবাসী ন্যানসেনকে অভ্যর্থনা জানাইল। যদিও ন্যানসেন মেরুতে পৌঁছিতে পারেন নাই তথাপি মেরু অঞ্চলের অনেক সমস্যারই তিনি সমাধান করিয়াছিলেন যাহার ফলে পরবর্তীকালে মেরুতে পৌঁছান সহজসাধ্য হইয়াছিল।

ন্যানসেনের পর আরও বহু অভিযাত্রী মেরুদেশে অভিযান চালান। কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ জীবন বিসর্জন দেন আর কেহ বা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সর্বপ্রথম মেরুতে পৌঁছিবার কৃতিত্ব যিনি অর্জন করেন তিনি হইতেছেন আমেরিকান অভিযানকারী রবার্ট প্যারী। বহুবার অভিযানে বিফল হইয়া ১৯০৮ সালে তিনি শেষবারের মত 'হয় জয় নয় ক্ষয়' প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইলেন। নিউইয়র্ক হইতে 'রুজভেল্ট' নামক জাহাজে করিয়া প্যারী ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই মেরু অভিযানে যাত্রা করিলেন এবং তিন মাসের মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ডের গ্রাণ্টল্যাণ্ড নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখান হইতেই প্রকৃতপক্ষে মেরু অভিযান আরম্ভ হইল। সাতজন অভিযাত্রী, ১৭জন এস্কিমো এবং ১৩৩টি গ্রীনল্যাণ্ডীয় কুকুর লইয়া প্যারীর দল গঠিত হইল। তখন মেরু অঞ্চলে রাত্রি চলিতেছে। তীব্র অধীরতা সহকারে প্যারী সূর্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যৌবনের সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর প্যারী মেরুদেশে কাটাইয়াছেন। এইবার শেষবার। কাজেই ত্রি-পঞ্চাশৎবর্ষীয় অভিযাত্রী প্যারীর আগ্রহ সহজেই অনুমেয়।

একটি অগ্রগামী দল প্রথমতঃ রাস্তা ঠিক করিবে এবং পরে অন্যেরা অগ্রসর হইবে—এই হইল পরিকল্পনা। এইভাবে ১৯০৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্যারী ৮৭ ডিগ্রী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মেরু আর মাত্র ১৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত। বিগতযৌবন অভিযাত্রীর প্রাণে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। এ পর্যন্ত প্যারী নিজে রাস্তা নির্বাচনের কাজে যোগদান করেন নাই। কিন্তু এখন তিনি ধৈর্যহারা হইয়া পড়িলেন। নিগ্রো ভৃত্য হেন্‌সন এবং চারিজন এস্কিমোকে সঙ্গে লইয়া প্যারী বাহির হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে মেরুতে সূর্যের আবির্ভাব হইল এবং বরফের বাধা দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। প্যারী দৈনিক দশ ঘণ্টা চলিয়া ২৫ মাইল অগ্রসর হইতে পারিলেন। আর কোন বিঘ্ন দেখা দিল না। ১৫ দিনের মধ্যে তিনি মেরুতে অর্থাৎ বিষুবরেখা হইতে ৯০ ডিগ্রী উত্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৪ ঘণ্টা মেরুতে অবস্থান করিয়া বহু ফটোগ্রাফ ও দূরবীনের সাহায্যে মানচিত্র গ্রহণ এবং ১৩ বার সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করিলেন। দুইখানি কাগজে নোট লিখিয়া বরফের মধ্যে পুঁতিয়া দিলেন। জয়ের গৌরবে প্যারী সকল দুঃখকষ্ট ভুলিয়া গেলেন। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। গর্বভরে মার্কিন পতাকা উড্ডীন করিয়া প্যারী কয়েক মাসের মধ্যেই দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীর এই কৃতিত্ব চিরদিন মেরু অভিযানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

—**ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য**

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "পৃথিবীতে যে কয়জন অসমসাহসী পুরুষ মেরু অভিযান করিয়াছেন ……ন্যানসেন চিরদিন তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিবেন।"—ন্যানসেনের সম্পূর্ণ নাম কি? সুমেরু অভিযানে তাঁহার স্থান পুরোভাগে কেন?

২। "প্যারীর এই কৃতিত্ব চিরদিন মেরু অভিযানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"—প্যারী কে? তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও। এই কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে বলিয়া লেখক কেন মনে করেন?

৩। "এমন সময় হঠাৎ ভগবানের আশীর্বাদ নামিয়া আসিল।"—কোন্ রচনার অন্তর্গত উদ্ধৃত পংক্তিটি? কাহাদের জীবনে আশীর্বাদ নামিয়া আসিল? এখানে কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে? কিভাবে তাঁহারা ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিলেন?

৪। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

"উহাব নাম দিলেন তিনি 'ফ্রাম'।" 'ফ্রাম' শব্দের অর্থ কি? উহা কি? ইহার বৈশিষ্ট্য কি ছিল? কে উহার এই নাম দিয়াছিলেন?

৫। "ন্যানসেন সঙ্গীদের এই কষ্টের কথা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন।"—ন্যানসেন কে? তাঁহার সঙ্গীরা কি কষ্ট পাইতেছিল? এই কষ্ট উপলব্ধি করিয়া তিনি কি করিলেন?

৬। "ফলে দ্রাঘিমা গণনা করা অসম্ভবই হইয়া উঠিল।"—দ্রাঘিমা কি? কিভাবে দ্রাঘিমা গণনা করা হয়? কাহার পক্ষে কি কারণে দ্রাঘিমা গণনা অসম্ভব হইয়া উঠিল?

৭। "১৯০৮ সালে তিনি শেষবারের মতো 'হয় জয় নয় ক্ষয়' প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইলেন।"—'তিনি' বলিতে কাহার কথা বলা হইয়াছে? তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? ঐ প্রতিজ্ঞা কতদূর সফল হইয়াছিল? 'হয় জয় নয় ক্ষয়' বলিতে কি বুঝায়?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। বিপরীত শব্দ লিখ: সুমেরু, ক্রমবর্ধমান, দুঃসহ, বিফল, আগমন, আবির্ভাব, উচ্চতা।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: সর্বোচ্চ, রহস্যাবৃত, প্রত্যাবর্তন, উল্লেখ, তত্ত্বাবধান, অন্বেষণ, স্বর্ণাক্ষরে।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখঃ শতাব্দী, অসম্ভব, প্রাণবিসর্জন, বিগতযৌবন, ধৈর্যহারা, দুঃখকষ্ট, স্বর্ণাক্ষরে।

৪। পদান্তর সাধন করঃ অভিজ্ঞতা, আবিষ্কৃত, শারীরিক, নৈপুণ্য, আত্মপ্রত্যয়, অধীরতা, দৈনিক, আবির্ভাব, নির্বাচন, সঞ্চার।

৫। শব্দার্থ লিখিয়া বাক্য রচনা করঃ ক্রমবর্ধমান, খামখেয়াল, অগ্রগমন, সহজসাধ্য, অনুমেয়, স্বর্ণাক্ষরে, চরিতার্থ।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির পার্শ্বে স্থূলাক্ষর পদগুলির যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেইগুলি শুদ্ধ, না, অশুদ্ধ তাহা লিখিয়া কি হইবে লিখ।

(ক) **কিন্তু** ন্যানসেনের আত্মপ্রত্যয় ছিল অপরিসীম (বিশেষণ)।

(খ) **সাতজন** অভিযাত্রী লইয়া প্যারীর দল গঠিত হইল (অব্যয়)।

(গ) ১৫ দিনের **মধ্যে** (সর্বনাম) **তিনি** (অব্যয়) মেরুতে...আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'সুমেরু অভিযান' নামকরণ তোমার কেমন লাগে? অভিযানের উত্তেজনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রবন্ধের আর একটি নাম দাও।

২। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল?

৩। 'হয় জয় নয় ক্ষয়' এই প্রতিজ্ঞা কে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে করিয়াছিলেন?

৪। প্যারী কোন্ দেশের মানুষ ছিলেন। ন্যানসেন কোন্ দেশের মানুষ ছিলেন?

৫। কি বল?

(ক) মেরু, (খ) বিষুবরেখা, (গ) দূরবীন, (ঘ) এস্কিমো।



[কাশীরাম দাস বঙ্গের জাতীয় কবি। ইঁহার জন্মকাল ষোড়শ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। উক্ত মহাভারত নানা পৌরাণিক আখ্যানের সংমিশ্রণে বাঙালী-মানসের উপযোগী ভক্তিরসাত্মক কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য "ভীষ্মের শরশয্যা" অংশে অর্জুনের বাণে আহত ভীষ্মের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দে সহজ সরল ভাষায় লিখিত এই পদ্যাংশে নীতি, ধর্ম, বীর্য ও প্রাজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়াছে।]

শিখণ্ডীরে আগে রাখি পার্থ মহাবীর।
লক্ষ বাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের শরীর॥
অর্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরের গিয়া বজ্রসম ফুটে॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥
শিখণ্ডী-পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর।
আমারে মারিছে মানি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেন মতে শরশয্যা নিল বীরবর॥

দেখিয়া কৌরবগণ হাহাকার করে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবারে॥

রথ হৈতে নামি ত্বরা ধর্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান লয়ে সর্বজন ॥
শরশয্যায় যেথায় আছেন ভীষ্মবীর।
প্রণাম করেন গিয়া হইয়া অস্থির ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্মপুত্রে প্রশংসিল ॥
মধুর কোমল স্বর অতীব গম্ভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি থাকব তাবৎ ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ ক্ষত্রবীর ॥
কোন্ বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয়-প্রধান।
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান ॥
শুনি রাজা দুর্যোধন ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেই ক্ষণে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন্ হেতু নৃপবর ॥
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবে ত অর্জুন বীর লয়ে ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
আনন্দিত হয়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥

শুন দুর্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোর তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি রাজা দুর্যোধন অতি ব্যস্ত হয়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পুরিয়ে ॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জুনেরে নিরখিল নির্ভয়-শরীর ॥
তবে ত অর্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পুরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে ॥

জল পান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্ত মন।
দুর্যোধনে চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥
ভাই-ভাই বিরোধ না কর কদাচিৎ।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
দুর্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥
দুর্যোধন না শুনিল হিত উপদেশ।
কাশী কহে কুরুকুল হবে এবে শেষ ॥

—কাশীরাম দাস

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "শিখণ্ডী-পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর / আমারে মারিছে মানি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥"—উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুইটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? ইহার রচয়িতা কে? 'আমারে' বলিতে এখানে কাহাকে বুঝানো হইয়াছে? শিখণ্ডী কে? পার্থ কে? পার্থ কেন শিখণ্ডীকে পশ্চাতে রাখিয়া তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন?

২। "কোন্ বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান / মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান॥"—উক্তিটি কাহার? কোন্ অবস্থায় থাকিয়া তিনি এই আহ্বান করিয়াছেন? কোন্ কোন্ বীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন? উক্ত বীরেরা কেমনভাবে বক্তাকে সাহায্য করিয়াছিলেন? বক্তা কাহার দেওয়া কি জাতীয় উপাধান গ্রহণ করিয়াছিলেন?

৩। "জল আনি দেহ মোর তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥"—কে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া জল আনিতে বলিলেন? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে 'জল' আনিলেন? উক্ত জল কেন বক্তা গ্রহণ করিলেন না? শেষ পর্যন্ত কিভাবে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত হইল?

৪। "দুর্যোধন না শুনিল হিত উপদেশ / কাশী কহে কুরুকুল হবে এবে শেষ॥"—'কাশী'র পরিচয় দাও। তিনি কেন এমন আশংকা করিলেন? 'দুর্যোধন' কে? তিনি কাহার কোন্ উপদেশ শুনিলেন না? দুর্যোধনকে প্রদত্ত উপদেশের উত্তরে তিনি কি বলিলেন?

৫। "ভীষ্মের শরশয্যা" কবিতা হইতে অর্জুন ও দুর্যোধনের চরিত্রের পরিচয় দাও।

৬। অল্প কথায় উত্তর দাও:

(ক) গঙ্গার নন্দন কে? ধর্মের নন্দন কে? ধনঞ্জয় কাহার নাম?

(খ) গাণ্ডীব কাহাকে বলে? কুরুকুল বলিতে কি বোঝায়?

(গ) 'অগ্নিসম বাণ ছুটে' বলিতে কি ধরনের বাণের কথা বলা হইয়াছে?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ দাও : বিন্ধিলেন, বিচারেন, স্পর্শে, ত্যজিয়া, প্রশংসিল, মম, দেহ, নিরখিল, ভেদিয়া, কর্‌হ, এবে, প্রবেশিল।

২। পার্থক্য লিখ : শর, স্বর ; শয্যা, সজ্জা ; উপাধান, উপাদান।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : সূচ্যগ্র, উত্তরায়ণ, ধনুঃশর, ধনুর্ধর।

৪। অর্থ লেখ : সম্প্রীত, সূচ্যগ্র, আকর্ণ, সোসর, অনুক্ষণ, ভৃঙ্গার, ত্বরা।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : মহাবীর, শরশয্যা, যুধিষ্ঠির, অনুক্ষণ, নির্ভয়-শরীর।

৬। এই কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি অব্যয়ের উল্লেখ কর।

৭। গদ্য কর (সাধু ভাষায়) :—

(ক) শিখণ্ডীরে আগে রাখি পার্থ মহাবীর।
লক্ষ বাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের শরীর॥

(খ) গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'ভীষ্মের শরশয্যা' কোন্ কবির কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ?

২। এই কবিতা হইতে মহাভারতের কয়টি চরিত্রের নাম পাও, বল।

৩। কাশীরাম দাস ব্যবহৃত এমন কয়েকটি শব্দ উল্লেখ কর, যে-শব্দগুলি কেবলমাত্র কবিতায় ব্যবহার হয়।

৪। কি বানান হইবে বল :
ত্যাজিয়া, ব্যাস্ত, ভীস্ম, প্রসংসিল, যুধিষ্টির।

৫। কবিতাটি আবৃত্তি কর :

(পয়ার ছন্দে কবিতাটি লিখিত। পয়ার ছন্দাশ্রিত কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তি ১৪ অক্ষরের ; প্রতি ২ চরণের অন্তে মিল ; প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ৪টি পর্ব।) এইভাবে কবিতা পড়িবে :

শিখণ্ডীরে / আগে রাখি / পার্থ মহাবীর।
লক্ষ বাণে / বিন্ধিলেন / ভীষ্মের শরীর॥



শ্রীমন্তের সিংহলগমনে খুল্লনার অনুমতি দান

[মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতকে ইঁহার আবির্ভাব। কবি-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবির বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা, যথার্থ শব্দসংগ্রহ ও তাদের নিপুণ সংযোজন, অলংকারের সুপ্রযুক্তি এবং অকপট সহজ সরল বর্ণনার চাতুর্যে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য কবিতাংশটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিকখণ্ডে'র ধনপতি সদাগরের কাহিনী হইতে উদ্ধৃত সামান্য খণ্ডাংশ। এই পদ্যাংশে শ্রীমন্তের দুঃখিনী মাতা খুল্লনার হৃদয়ের অভিব্যক্তির বাস্তব এবং সহজসুন্দর রূপায়ণ হইয়াছে—এ যেন সন্তানের বিদেশগমনে উদ্বিগ্ন কোমলস্বভাবা বাঙালী মায়ের চিত্র।]

যাইবে সিংহল দেশ পাইবে বহুত ক্লেশ
তরণী-সরণী বহুদূর।
মাস দুই তিন ব্যাজ করিয়া রাজার কাজ
সাধু আসিবেন নিজ পুর॥
অকারণে কর শোক পাঠায়্যাছিলাম লোক
কল্যাণে আছেন তোর বাপ।
ভূপতির মনোরথে গেছেন তরণীপথে
নিরন্তর করি আমি তাপ॥
ছিল ডিঙ্গা খান সাত লয়্যা গেল তোর তাত
একখানি নাই অবশেষ।
সিংহল জলের পথ মিছা কর মনোরথ
করিবারে পিতার উদ্দেশ॥

যদি শত কারিকর গড়ে ডিঙ্গা সংবৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখানি।
যদি ডিঙ্গা কর সাজ কেবল ধনের কাজ
অবলার কতেক পরাণী।
তথা বহু তিমিঙ্গিল আছে প্রাণপীড়াশীল
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে টমক শিঙ্গা পাখ্যা ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা
সেই দেশে সঙ্কট জীবন।
যাবে হে সাগর বায়্যা সে পথে না জীয়ে নায়্যা
প্রাণের সঙ্কট লোণা বায়।
কহিতে পরাণ ফাটে মকরে মানুষ কাটে
দূরে যাকু সিংহল উপায়॥
জলে কুম্ভীরের ভয় কূলে শার্দূলের চয়
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় বহুত ক্লেশ
পিতা মোর কহিয়াছে তত্ত্বে॥
উড়ুক কচ্ছপগুলা শসা পারা মশাগুলা
জলৌকা কুঞ্জরশুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হর‍্যা লয় বিত্ত
শুন্যাছি দেশের দুরাচার॥
খুল্লনা যতেক বলে শুনি সাধু কোপে জ্বলে
অনুমতি না দেই ভোজনে।
খুল্লনা সুধীরমতি বুঝিয়া কার্যের গতি
আজ্ঞা দিলা সিংহল গমনে॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "যাইবে **সিংহল দেশ** পাইবে **বহুত ক্লেশ**"—উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবিতার? কে কাহাকে ইহা বলিতেছেন? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সিংহলে যাইতে চাহিতেছেন কেন? সিংহল গমন করিলে কি কি ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা বলিয়া বক্তা মনে করেন?

২। ধনপতির কুশল সংবাদ দিয়া শ্রীমন্তের মাতা শ্রীমন্তকে কেমনভাবে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছেন, তাহার বর্ণনা দাও।

৩। "খুল্লনা সুধীরমতি বুঝিয়া কার্যের গতি"—খুল্লনা কে? খুল্লনা কার্যের গতি বুঝিয়া কি করিলেন? 'কার্যের গতি' কিরূপ হইয়া পড়িয়াছিল?

৪। বুঝাইয়া দাও: (ক) তথা বহু তিমিঙ্গিল·········সঙ্কট জীবন॥ (খ) জলে কুম্ভীরের·····কহিয়াছে তত্ত্বে॥ (গ) উড়ুস কচ্ছপগুলা······দেশের দুরাচার।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখ: ব্যাজ, পুর, পরাণী, তিমিঙ্গিল, মকর, তত্ত্বে, উড়ুস, জলৌকা, কুঞ্জরশুণ্ডাকার।

২। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর: বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলীর ১নং প্রশ্নের স্থূলাক্ষর পদসমূহ।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: তরণী-সরণী, সংবৎসর, তিমিঙ্গিল, পাপচিত্ত, সুধীরমতি।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'শ্রীমন্তের সিংহল গমনে খুল্লনার অনুমতি দান' কবিতাটির অন্য একটি নাম নির্দেশ কর। কেন এমন নামকরণ করিলে বল?

২। কবিতাটি কবির কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

৩। শ্রীমন্তের পিতার নাম কি?

৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়টি খণ্ড? তোমার পঠিত কবিতাটি কোন্ খণ্ডের অন্তর্গত?

আনারস

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগসন্ধিকালের কবি। তাঁহার জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৫৯-এ। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-মানসিকতায় একাধারে প্রাচীনতা এবং প্রগতিশীলতা লক্ষ্য করি। এতদ্ব্যতীত অতি সাধারণ বিষয়বস্তু লইয়াও যে হালকা, সরস কৌতুকপূর্ণ উপভোগ্য কবিতা রচনা করা যায়, এরূপ উদাহরণ তাঁহার কাব্যে লভ্য।]

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
নাহি করে মুখভঙ্গী কথা নাহি কয়।
সৌরভে গৌরবে দেয় নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র নেত্র পুলকিত॥
ফেলিয়া পোনের-আনা এক-আনা রাখে।
এই হেতু আনারস বলে লোকে তাকে॥
আমাদের আনারসে ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
আনারসে করি রসে ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরোদ নহ-ত তুমি নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর॥
কৃপণের কর্ম নয় তোমার আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার॥

ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্‌শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোক্‌খেকো লোকে॥
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়।
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায়॥
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খায় বেচে বাড়িঘর॥
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস করো মরণের কালে॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।" এখানে কাহার 'মোহন মূর্তি'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে? কে ঐরূপ মূর্তি দেখিয়া অভিভূত? তোমার নিজের ভাষায় উক্ত 'মোহন মূর্তি'র পরিচয় দাও।

২। "আনা দরে আনা যায় কত আনারস।"—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? উহার রচয়িতা কে? উদ্ধৃত পংক্তিটিতে 'আনা' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বল।

৩। অল্প কথায় উত্তর দাও:

(ক) "এই হেতু আনারস বলে লোকে তাকে।"—কোন্ হেতু? ইহা কি সত্য বলিয়া তোমার ধারণা? (খ) "অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।"—অন্তিম মুহূর্তে কবির কি প্রার্থনা?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ: মনোহর, অনুরূপ, ত্রিভুবন, চোক্‌খেকো, বাড়িঘর, অরুচি।

॥ মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। কবির সময় আনারস কি দরে পাওয়া যাইত? এখন আনারসের কি দর বলিতে পারো?

২। 'আনারস' কবিতার কোনো অংশ কি তোমার অতিরঞ্জিত মনে হয়? কোন্ অংশ?



[নবীনচন্দ্র সেন (জন্ম ১৮৪৭ ; মৃত্যু ১৯০৯)। কবি আখ্যানকাব্য, খণ্ডকবিতা এবং মহাকাব্য রচনা করিয়া খ্যাতকীর্তি হন। হেমচন্দ্র এবং মধুসূদনের দ্বারা তিনি অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে একাধারে ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং নব্যযুক্তিবাদ লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য কবিতায় অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধদেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়া পার্থিব সুখের সাধনা এবং অধ্যাত্মসাধনার কথা কর্ষণের রূপকে বলা হইয়াছে।]

কৌশাম্বীর মনোহর মুকুল পর্বতে,
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা সদ্যঃস্নাতা,
সমেঘ বিদ্যুৎ-বারি-মণ্ডিতা ভূষিতা,
কাটাইয়া বর্ষা ধ্যানে নির্বাণের সুখে
নিরজনে, চলিলেন করিতে প্রচার
নব ধর্ম নব বলে পুনঃ তথাগত
নব শরতের সহ। একনালা গ্রামে
যাইতেছে ভরদ্বাজ ভূস্বামী ব্রাহ্মণ
বহু হল সহ ক্ষেত্রে, ভিক্ষাপাত্র করে
দাঁড়াইয়া বুদ্ধদেব দুয়ারে তাহার
নতমুখে। ক্রোধে বিপ্র হইয়া অধীর
কহিল—"শ্রমণ! দেখ করিয়া কর্ষণ
বহু শ্রমে ভূমি, বীজ করিয়া বপন,

উৎপন্ন করিয়া শস্য করি' আহরণ,
করি আমি আপনার জীবন ধারণ।
বিনাশ্রমে এ সংসারে আহার কাহারো
নাহি মিলে। তব সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর
বলী বলীবর্দ প্রায়, কেন অকারণে
তবে তুমি অপরের হও গলগ্রহ ?
কর্ষণ করিয়া ভূমি করগে বপন
বীজ তাহে, মিলিবেক যথেষ্ট আহার।"
বুদ্ধ অবনত মুখে উত্তরিলা ধীরে—
"ব্রাহ্মণ! আমিও ভূমি করিয়া কর্ষণ
বহুশ্রমে, তাহে বীজ করিয়া বপন,
উৎপন্ন করিয়া শস্য, করি তা আহার!"
বিস্মিত ব্রাহ্মণ কহে—"কৃষিজীবী তুমি!
দেখিতে না পাই কই চিহ্ন তো তাহার।
কোথায় বলদ তব ? কোথা বীজ ? হল ?"
"বিশ্বাস আমার বীজ," বুদ্ধ উত্তরিলা,
"আমার শস্যের ক্ষেত মানব-হৃদয়।
ধর্ম মম হল, বোধি বলদ আমার,
নির্বাণ আমার শস্য—অমর অক্ষয়।"
খুলিল নয়ন, পদপ্রান্তে ভরদ্বাজ
পড়িয়া মাগিল দীক্ষা, লইয়া সন্ন্যাস।

—নবীনচন্দ্র সেন

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "চলিলেন করিতে প্রচার / নবধর্ম নব বলে পুনঃ তথাগত / নব শরতের সহ।"—'নবধর্ম' কি? 'তথাগত' কে? ধর্মপ্রচারের সময় তিনি কি জাতীয় বাধা পাইলেন? উক্ত বাধা তিনি কিভাবে অতিক্রম করিলেন?

২। "নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা"—কে কিরূপ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিলেন?

৩। বুদ্ধদেবও যে একজন কৃষিজীবী তাহার কি প্রমাণ তিনি দিয়াছেন?

৪। ভরদ্বাজ কে? তাহার সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথনের বর্ণনা দাও। কথোপকথনের পরবর্তী ঘটনা কি?

৫। তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও: (ক) তব সুস্থ বলিষ্ঠ……হও গলগ্রহ? (খ) বিশ্বাস আমার বীজ · অমর অক্ষয়।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ লেখ: নিরখিয়া, নিরজনে, মিলিবেক, উত্তরিলা, মাগিল।

২। প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও: (ক) মনোহর, কাহারো, যথেষ্ট, সন্ন্যাস (সন্ধি বিচ্ছেদ), (খ) সদ্যঃস্নাতা, বিদ্যুৎ-বারিমণ্ডিতা, নবধর্ম, ভূস্বামী, ভিক্ষাপাত্র, অধীর, কৃষিজীবী, মানব-হৃদয়, অমর, অক্ষয় (ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়), (গ) সদ্যঃস্নাতা, নির্বাণ, বিপ্র, কর্ষণ, বপন, বলীবর্দ, গলগ্রহ, বোধি (অর্থ), (ঘ) বলি, বলী, ; বর্ষা, বর্শা (অর্থের পার্থক্য), (ঙ) ধ্যান, কর্ষণ, চিহ্ন, দীক্ষা, সন্ন্যাস (পদান্তর)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'দুই কৃষিজীবী' নাম কেন হইল বুঝাইয়া দাও। আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে?

২। (ক) কোথায় বল: কৌশাম্বী, মুকুল, (খ) কিসের নাম বল: একনালা, শরৎ, (গ) কাদের বলা হয় বল: শ্রমণ, কৃষিজীবী, ভূস্বামী।

৩। যথাযথ সাজাইয়া দাও:

বীজ	নির্বাণ
শস্যের ক্ষেত	ধর্ম
হল	বিশ্বাস
বলদ	বোধি
শস্য	মানব-হৃদয়

অন্ধ কবি

[হেমচন্দ্রের জীবৎকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ। গীতিকবিতা এবং মহাকাব্য —উভয় প্রকার কাব্যেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল। আলোচ্য কবিতাটি একটি গীতিকবিতা। ত্রিপদী ছন্দে রচিত এই কবিতাটিতে অন্ধকবি হেমচন্দ্রের অন্তর্জীবনের প্রবল নৈরাশ্যের বেদনা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অকৃত্রিম অনুভূতি এবং সহজ প্রকাশভঙ্গী কবিতাটির বৈশিষ্ট্য।]

একটি কুঠারাঘাত   শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন !
সব আশা চূর্ণ করে   রাখিলে অবনী 'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
জীবনে বাসনা যত   সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর   এ ভবের শ্রী-ভাণ্ডার
চির-অস্তমিত দিনমণি !
ধরা, শূন্য, স্থল, জল   অরণ্য, ভূমি, অচল
না থাকিবে কিছুরি বিচার
না রবে নয়নে দৃষ্টি   তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার।
প্রতিদিন অংশুমালী   সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ   হবে না কি হে ভবেশ !
জানিব না, দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু   আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্তকাল,   আসে যাবে চিরকাল,
আর না দেখিব কোন কালে।

নিজ কন্যা-পুত্র মুখ, পৃথিবীর সার সুখ
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব ভাবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ;
জীবনের শেষ কালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "একটি কুঠারাঘাত .....ভবের স্বপন !"—'কুঠারাঘাত' শব্দটির অর্থ কি ? এখানে 'কুঠারাঘাত' কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে ? ঐরূপ আঘাতের ফলে বক্তার মনে কি ভাবোদয় হইয়াছিল ?

২। "জীবনের শেষ কালে…দুঃখে কর পার।"—কে এমন করুণ বিলাপ করিতেছেন ? 'হরিয়া' শব্দটির গদ্যরূপ কি ? কে বক্তার 'সকলি হরিয়া' লইয়াছেন ? 'সকলি' বলিতে এখানে কি বোঝানো হইয়াছে ?

৩। তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও : (ক) প্রতিদিন অংশুমালী…দিবা কারে বলে ? (খ) আর না সুধার-সিন্ধু · কোন কালে।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লিখ : অবনী, তমোময়, ইন্দু, ভবলীলা।

২। সমাস দেখাও : কুঠারাঘাত, অংশুমালী, শিশিরবিন্দু, ভবলীলা।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'অন্ধ কবি' কবিতাটি কাহার লেখা ? পৃথিবী-বিখ্যাত আর একজন অন্ধ কবির নাম বল।

২। 'অংশুমালী' শব্দটির অর্থ কি ? ইহার পাঁচটি সমনাম শব্দ বল।

সরস্বতী

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ১৮২৪ ; মৃত্যু ১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে বীররসাত্মক কাব্য, নাটক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টারূপে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। বস্তুতপক্ষে বাংলা কাব্যে এবং নাটকে তিনি আধুনিকতাকে প্রবর্তন করিয়া প্রতিষ্ঠাদান করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের সৃজন-প্রতিভা বঙ্গকাব্যসাহিত্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। নিম্নোক্ত কবিতাটি একটি চতুর্দশপদী কবিতা (sonnet)। এখানে কবি বলিতেছেন, সংসার হইতে প্রাপ্ত বিভিন্নমুখী অবহেলা ও আশাভঙ্গের ফলে তাঁহার জীবন সুখময় ছিল না; কিন্তু এই যন্ত্রণার মধ্যে তিনি সান্ত্বনা পাইতেন কেবলমাত্র কাব্যসাধনায়।]

তপনের তাপে তাপি' পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষ্ণাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাশা নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বয়ে তারে ?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধু-মাখা কথা কয়ে স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি', কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "এই ভাবি', কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!"—'কৃপাময়ী' কে? বক্তা কি ভাবিতেছেন, সংক্ষেপে নিজ ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

২। "এ দাস তেমতি,...ধরে রাঙা পা দুখানি"—এখানে 'দাস' কে? 'তেমতি' বলিতে কি বোঝানো হইতেছে? 'রাঙা পা দুখানি' কাহার? কেন তিনি ঐ 'পা দুখানি' ধরিতে চাহেন?

৩। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও: (ক) তিন ভুবন কি কি? তিন ভুবনে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি? (খ) কোন্ কোন্ অবস্থা হইতে তিনি আমাদের সান্ত্বনা দিয়া থাকেন? (গ) সরস্বতী কিসের দেবী?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ কর: তাপি, হেরি, ধায়, সান্ত্বয়ে, নিবারিতে, আশে।

২। কবিতাটির অষ্টম পংক্তিতে 'সরস্বতী' বানান 'সরস্বতি' হইল কেন?

৩। শুদ্ধ বানানটি লেখ: স্বরসতী, ব্যাগ্র, সান্তয়ে, চরনে।

৪। পদান্তর কর: পিপাসা, দুখ, আশ্রয়, স্নেহ, কৌশল।

৫। বন্ধনী-মধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও: (ক) দড়ে রড়ে, সান্ত্বয়ে (অর্থ); (খ) সান্ত্বয়ে (কি ধাতু); (গ) তৃষ্ণাতুর (সন্ধি বিচ্ছেদ ও সমাস নির্ণয়); (ঘ) আঁচলে (মূল শব্দ কি); (ঙ) নিবারিতে (কি ধাতু)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'সরস্বতী' কবিতাটি আবৃত্তি কর। কবিতাটি কি জাতীয়?

২। 'সরস্বতী' কবিতাটির যে যে অংশে কবি শিশুর সঙ্গে নিজেকে এবং মাতার সঙ্গে সরস্বতীকে তুলনা করিয়াছেন, সেই অংশটি আবৃত্তি কর।

৩। মধুসূদনের নামের আগে 'মাইকেল' বলা হয় কেন? তিনি কি বাঙালী ছিলেন না?

বীরবাহুর পতন

['বীরবাহুর পতন' কাব্যাংশটি মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" কাব্যের প্রথম সর্গের অংশবিশেষ। আমাদের সাহিত্যে 'মেঘনাদবধ' কাব্য বিভিন্ন দিক হইতেই তুলনারহিত। মহাকবির জীবন-চেতনা এবং মহাকাব্যিক কল্পনা কাব্যটিকে সার্থক এবং যথার্থ 'মহাকাব্য' রূপে চিহ্নিত করিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রয়োজনমত বিবর্তিত করিয়া, আপন ভাবনার আলোকে মধুসূদন সম্পূর্ণ মৌলিক একটি কাব্য রচনা করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে বীরচূড়ামণি বীরবাহুর সমরক্ষেত্রে ভৈরব আবির্ভাব এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে।]

এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুর সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।

অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"

"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া

বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !"—
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "হায়, লঙ্কাপতি,…বীরবাহুর বীরতা ;"—কে কাহাকে 'লঙ্কাপতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে? বীরবাহু কে ? 'বীরবাহুর বীরতা'র পরিচয় দাও।

২। "এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল ভগ্নদূত"—ভগ্নদূত কে ? সে যে ঘটনার বিবরণ দিয়া কাঁদিয়াছিল, তাহা নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। "রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে কুমারে !"—'আক্রমিলা' শব্দটির অর্থ কি ? রামচন্দ্র কাহাকে আক্রমণ করিলেন ? কবির অনুসরণে ঐ আক্রমণের একটি লিপিচিত্র অঙ্কন কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দাও :

(ক) মদকল করী…ধনুর্ধর। (খ) "কনক-মুকুট শিরে, রতনে খচিত।"

(গ) অগ্নিময় চক্ষুঃ…রণে কুমারে! (ঘ) ডমরুধ্বনি শুনি,…নিবাসে বিবরে?

৫। অল্প কথায় উত্তর দাও :

(ক) বীরবাহুর 'ভৈরব হুঙ্কার' সম্বন্ধে ভগ্নদূতের মন্তব্য কি?

(খ) যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের আবির্ভাব-মুহূর্তটি বর্ণনা কর।

(গ) 'লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে কহিলা'—ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরোচিত মৃত্যুবরণের কাহিনী শুনিবার পর রাবণ কি বলিয়াছিলেন? একই সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠে হর্ষ এবং বিষাদের স্বর কেন?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লেখ : অমর-ত্রাস, ইরম্মদ, ঘনাকারে, সন্দেশ-বহ, দশাননাত্মজ, দশরথাত্মজ, হর্য্যক্ষ, কম্বু, কলম্বকুল।

২। সন্ধি কর : নরেন্দ্র, চর্মাবলী, ধনুর্ধর, ঘনাকার, দশাননাত্মজ, দশরথাত্মজ।

৩। সমাস নির্ণয় কর (ব্যাসবাক্যও লিখিবে) : লঙ্কাপতি, ধনুর্ধর, ত্রিভুবনে, দশাননাত্মজ, রক্ষঃকুলনিধি, সমর-তরঙ্গ, রাজেন্দ্রপদে।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর : ধনু ধারণ করেন যিনি, সিংহের গর্জন, তিন ভুবনের সমাহার, আগুনের শিখার মত, বীরপুত্র ধারণ করেন যিনি।

৫। শুদ্ধ কর : দ্বন্দি, ফণী, হর্য্যথ্য, অরী, গজযুথ, বৃষস্কন্ধে।

৬। পার্থক্য দেখাও : বলি, বলী; শূর, স্বর; করি, করী।

৭। গদ্যরূপ লিখ : আদেশিলা, পশিলা, হিয়া, স্মরিলা, আরম্ভিলা, যুঝিল।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'বীরবাহুর পতন' কোন্ কবির লেখা? কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

২। 'মেঘনাদবধ' কাব্যগ্রন্থটিকে কি জাতীয় আখ্যা দেওয়া হয়? এই কাব্যটি কোন্ ছন্দে লিখিত?

৩। (ক) তোমার পঠিত কাব্যাংশে বীরবাহুকে কি কি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে? (খ) রামচন্দ্র বীরবাহুকে আক্রমণ করিবার ঠিক পরবর্তী অবস্থাটি বর্ণনা কর।

৪। বিষয়বস্তু অনুসরণ করিয়া কাব্যাংশটির একটি নতুন নামকরণ কর।

আষাঢ়

[রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষা। তাঁহার বহু কবিতা ও গান এই ঋতুকে অবলম্বন করিয়া রচিত। নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় বর্ষার একটি নিবিড় চিত্র অংকিত হইয়াছে। কবিতাটিতে একদিকে যেমন বর্ষাপ্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের চিত্র আছে, তেমনি কবিতাটির আদ্যন্ত এক নিবিড় মমতাও লক্ষ্য করিবার মত।]

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউসের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি,
মাঠে গেছে যারা, তারা ফিরেছে কি,
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারা দিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে॥

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ;
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।

পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দর দর বেগে জলে পড়ি জল
ছল ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে ॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।

ঝর ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘন ঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আষাঢ়-প্রকৃতির রূপচিত্রণ কর।

২। 'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥'—কে কাহাদের উদ্দেশে এই নিষেধাত্মক উক্তি করিয়াছেন? কেন এই নিষেধ?

৩। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) বর্ষাকালে আষাঢ়-গগনের অবস্থা কিরূপ? (খ) 'ওই ডাকে শোনো'—কে ডাকিতেছে? ঐ ডাক শুনিবার পর কবি কি করিতে বলিতেছেন? (গ) 'খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।'—এখানে 'আজি' বলিতে কোন্ দিনের কথা বলা হইয়াছে? ঐ দিনটির বর্ণনা দাও। কেন ঐ দিনে খেয়া-পারাপার বন্ধ?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ লিখ: ঠাঁই, পোহালে, গোহালে, দুলে, ডাকিছে।

২। অর্থ লিখ: তিল, কূল, নিচোল, বেণুবন, খোয়ালে।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: রাখাল বালক, খেয়া-পারাপার।

৪। কি পদ হইবে লিখ: **কালিমাখা** মেঘে, ঘনঘন, ছলছল, পূবে হাওয়া **বয়**, আকাশ **আঁধার,** কে ডাকিছে **বুঝি মাঝিরে** (স্থূলাক্ষরগুলি)।

৫। পদান্তর সাধন কর: নীল, ঘর, পিছল, দিন, মাঠ।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। বর্ষা-প্রকৃতির সুন্দর একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন একটি কবিতার নাম কর। কবিতাটি কে লিখিয়াছেন? কবিতাটি পড়িয়াছ? কেমন লাগিল?

২। 'আষাঢ়' কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। 'আষাঢ়' জাতীয় বর্ষার কবিতা কি পড়িয়াছ, এমন কয়েকটি কবিতার নাম বলো তো? ঐ কবিতাগুলো পড়িয়াছ কি?

৪। রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ ঋতু লইয়া কবিতা বা গান লিখিয়াছেন? কোন্ ঋতুটি কবির সর্বাপেক্ষা প্রিয়?



[ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ—জন্ম (১৮৬১ খ্রীঃ) কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে, মৃত্যুও (১৯৪১ খ্রীঃ) কলিকাতায়। এমন অনন্যসাধারণ সর্বতোমুখী প্রতিভা পৃথিবীর যে-কোন দেশের পক্ষেই ঈর্ষণীয়। বিচিত্রধর্মী কবিতায় তাঁহার সাহিত্য-সাজি অফুরান হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে কবি গল্পের আভাসে একটি ভারতীয় আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রঘুনাথের বহুমূল্য উপহার গুরুর নিকট মূল্যহীন; গুরুদেবের ত্যাগের প্রদীপ্ত মহিমা তথা তাঁহার নির্বিকার ভাব আমাদের বিস্ময়ে মূক করিয়া দেয়।]

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণ-তট শ্যামশিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।
বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়।
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে!
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে,
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন ;
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা ;
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি' করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুই পাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচী-মুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিল রাখি'
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা"—চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়,
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিল মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু ;
যমুনা উতলা করি মিলিল না কিছু।
সিক্ত বসন ল'য়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরুকাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি," করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীজলে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা"—'উতরিলা' শব্দটির গদ্যরূপ কি হইবে ? রঘুনাথ যে-স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানটির বর্ণনা দাও। অথবা, যমুনা নদী এবং উহার তীরবর্তী স্থানসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

২। "দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার"—কে কাহাকে কি উপহার দিতে আনিয়াছিল? প্রভু কেমনভাবে উক্ত উপহার গ্রহণ করিলেন?

৩। কাব এবং কবিতার নাম উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও:

(ক) স্থির তারা ····অচল শিকলে। (খ) হীরকের সূচী-মুখ······ আলোকের ছুরি। (গ) আগ্রহে যেন······ধরিবারে যায়।

৪। "দ্বিতীয় বলয়খানি······ওই নদীজলে।"—কোন্ প্রশ্নের উত্তরে গুরুর এই বক্তব্য? প্রথম বলয়-সংক্রান্ত ঘটনাটি কি? দ্বিতীয় বলয়খানি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গুরুদেব রঘুনাথকে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ কর: পশি, হেথা, উতরিলা, নমি, আশীষিলা, নিবেশিলা, যাচে।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: পাষাণ-তট, শ্যামশিলাতল, নিশিদিন, তৃণহীন, কাঁটাগাছ, প্রতিদিন, ভগবৎ-লীলা, সূচী-মুখ, প্রাণ-মন-কায়, সিক্ত বসন।

৩। স্থূলাক্ষরগুলি কি পদ লেখ: (ক) **'আহা আহা'**—চীৎকার করি **রঘুনাথ**। (খ) **যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল**। (গ) **স্থির তারা** নিশিদিন **তবু** যেন **চলে**।

৪। বন্ধনী-মধ্যস্থ নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর লেখ: (ক) নির্ঝর (সর্বনাম শব্দ)। (খ) স্বচ্ছ, দীন, গুরু, আগ্রহ, নিভৃত (পদান্তর)। (গ) গুরু, দীন (লিঙ্গান্তর)। (ঘ) বারেক (সন্ধি বিচ্ছেদ)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। কবিতাটির শেষাংশে শিখগুরু যে আচরণ করিলেন, তাহা তোমার কেমন মনে হয়?

২। কবিতাটির নাম কেন 'নিষ্ফল উপহার' রাখা হইল, বলো তো?

৩। 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটিতে যে নির্ঝর এবং গিরিমালার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোন্ অঞ্চলের বলিয়া তোমার মনে হয়? কবিতার গুরুদেব জাতিতে কি?

৪। উপহার-দেওয়া প্রথম বালাটি যখন নদীর জলে পড়িয়া গেল, তখন রঘুনাথের মনোভাবটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই মনোভাবটি কবির ভাষায় বল।



হ'তে পার্তাম

[নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অধিবাসী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওরফে ডি. এল. রায় (খ্রীঃ ১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা সাহিত্যে কবি ও নাট্যকাররূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ব্যঙ্গ ও হাসির গানের 'রাজা'। এই শ্রেণীর কবিতারই অন্যতম উদাহরণ নিম্নোক্ত কবিতাটি। ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষম অথচ বাক্যবাগীশ এক রাজা এবং তাঁহার অন্ধ স্তাবকদিগের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে আলোচ্য কবিতাটিতে। প্রকারান্তরে কবি বড়লোক ও মোসাহেবদের তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। অপূর্ব বর্ণনা কবিতাটিকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।]

রাজা ॥ দেখ, হ'তে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ, কেমন করিনা পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব একটা বড়—
পারিষদবর্গ॥ হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা ॥ দেখ হ'তে পার্তাম নিশ্চয় একজন উঁচু দরের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো
গরমিল হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে না,
রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও
দেয় না ক সে সাড়া ;

তা হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই
দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব এক উঁচু—
পারিষদবর্গ॥ হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা॥ দেখ, হ'তে পার্তাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেলে রুখে দাঁড়ায়
বিদ্রোহী ভাবগুলি হে,
তা হাজার কাশি, আদর করি
দাড়িতে হাত বুলিয়ে ;
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ॥ হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা॥ দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও-সেও
ওই কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে না ক কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা তা নইলে—বুঝলে কিনা—
পারিষদবর্গ॥ হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "দেখ, হ'তে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর"—নিজের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কাহার? কাহাদের উদ্দেশে তাঁহার এই ঘোষণা? 'মস্ত একটা বীর' হইবার পথে বক্তার বাধা কোথায়? অবশেষে তিনি কি হইয়া রহিলেন?

২। "দেখ হ'তে পার্তাম 'নিশ্চয় একজন উঁচু দরের কবি"—কে কাহাদের উদ্দেশে এই উক্তি করিয়াছেন? কি কারণে তিনি বড় কবি হইতে পারিলেন না?

৩। রাজনৈতিক বক্তা এবং একজন কেষ্ট-বিষ্টু হওয়ায় কি বাধা ছিল রাজার, তাহা রাজার মনোভাব অনুসরণে ব্যক্ত কর।

৪। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও:

(ক) "হ্যাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত"—উক্তিটি কাহাদের? কবিতাটি পড়িয়া বক্তাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জন্মে? (খ) প্রতিভার উন্মোচনের পথে কোন্ বস্তুটির সাহায্য পাইলে রাজা সার্থকতা লাভ করিতেন তাহা উল্লেখ কর। (গ) কবিতার মূল ভাবটি বুঝাইয়া দাও।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। বন্ধনী-মধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর লেখ: (ক) সঙ্গীন, ধন্দ, গরমিল, (অর্থ)। (খ) হতে পার্তাম, চ'টে ম'টে, রয়ে (সাধু গদ্যে কি হইবে)। (গ) নিশ্চয়, শিরোহীন, নীরব (সন্ধি বিচ্ছেদ)। (ঘ) গোলাগুলি, বাক্যবীর, গরমিল, নীরব কবি, অবাধ্য স্ত্রী, কেষ্ট-বিষ্টু, নিঃসন্দেহ, বৈঠকখানা বক্তা (ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম)। (ঙ) মাথায় লাঠি মাল্লেও (কারক-বিভক্তি)। (চ) বীর, স্থির, বিদ্রোহী (পদান্তর)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'হ'তে পার্তাম' কবিতাটিকে কি জাতীয় আখ্যা দিবে? রাজার চরিত্রটি তোমার কেমন লাগে? বর্তমানে সমাজে কোন্ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐ জাতীয় মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

২। 'পারিষদবর্গ' এই কবিতায় রাজাকে কেমনভাবে সাহায্য করিয়াছে?

ঝর্ণা

[বাংলা সাহিত্যে "ছন্দের যাদুকর" রূপেই সত্যেন্দ্রনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ। খ্যাতনামা মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের এই পৌত্রের জীবনকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অসীম কৌতূহল ছিল। খাঁটি বাংলা ভাষার পার্শ্বে তৎসম শব্দরাজি সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া ছন্দের বৈচিত্র্যে তিনি অসামান্য রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য কবিতায় ঝর্ণার উৎপত্তি, রূপচিত্রণ এবং কর্মময়তা ঝর্ণারই নৃত্যচপল ছন্দোময় ভঙ্গীকে আশ্রয় করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।]

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দনবর্ণা।
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্‌না;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা !

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে !
মেখলায়, মরি মরি রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !"—কবি-বর্ণিত সুন্দরী ঝর্ণার একটি লিপিচিত্র অঙ্কন কর।

২। ঝর্ণা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে আবির্ভূত হইয়া কেমনভাবে নূতন সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে, সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

৩। তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও : (ক) অঞ্চল সিঞ্চিত……তাপসী অপর্ণা। (খ) মেঘ হানে…লাগি ধর্ণা ! (গ) ধূসরের…ভরসায় ভরনা। (ঘ) স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা ! (ঙ) মোতিয়া মতির…বিদ্যুৎপর্ণা !

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ লিখ : শ্যামলিয়া, মূরছে, ভরি।

২। অর্থ লিখ : চন্দ্রিকা, অপর্ণা, উতরোল, গিরি-দরী, ঊষর, মঞ্জুল।

৩। বন্ধনী-মধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও : (ক) ডাকে **তোরে** চিত-লোল **উতরোল** সিন্ধু, **ওলো** চঞ্চলা, **তোর** পথ **হ'ল ছাওয়া** যে, মেখলায় **মরি মরি** (স্থূলাক্ষর শব্দগুলি কি জাতীয় পদ)। (খ) চন্দনবর্ণা, গিরি-মল্লিকা, জুঁইফুলী বৃষ্টি, গিরি-দরী-বিহারিণী, হরিচরণ-চ্যুতা (ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়)। (গ) হরিণ, যৌবন, তাপসী, চঞ্চলা, সখী (লিঙ্গান্তর)। (ঘ) সুধা, তৃষ্ণা, চঞ্চলা (বিপরীত শব্দ)। (ঙ) ঝরনা, মুরছে, চন্দণ, বেলোয়াড়ি (শুদ্ধ রূপ)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। সত্যেন দত্তের নামের আগে সাধারণতঃ কি বিশেষণ ব্যবহার করা হয় ? ওঁর লেখা কি কি কবিতা পড়িয়াছ ?

২। 'ঝর্ণা' কবিতার মধ্য হইতে কোন্ শব্দসমষ্টি বা উপমা পড়িয়া বোঝা যায় : (ক) ঝর্ণা মরুভূমিকে শ্যামল করিয়া তোলে ; (খ) ঝর্ণার উচ্ছল চঞ্চলতা।

বৃন্দাবন অন্ধকার

[একাধারে কবি ও সমালোচক কালিদাস রায়ের জন্ম ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৭৫-এ। পল্লীবাংলার শান্ত সুষমা, সহজ প্রেম ও সুন্দর প্রকৃতি তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য। ইহা ব্যতীত বৈষ্ণব ভাবুকতায় তাঁহার কবিমানস আচ্ছন্ন। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ভাবনা-বিদ্ধ গাঢ় বেদনার রসে সমুজ্জ্বল একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।]

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ছোঁয় না তৃণ গোধনগুলি, ছুটিছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না শ্যাম-রাধিকা লয়ে শারিকা-শুক দ্বন্দ্ব আর।
সজল-ঢল-আয়ত আঁখি পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি',
ঘুরিছে খুঁজি' লেহন করে মৃগ পদারবিন্দ কার?
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

সলিল-কেলি-ফেনিল জলে যমুনা আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি' ক'রেছে খেয়া বন্ধ তার।
নূপুর হার হারানো-ছলে, বধূরা মিছে যমুনা জলে,
করে না ব্যাজ শুনিয়া আজ বাঁশিটি শ্যাম-চন্দ্রমার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

বাতাসে শ্বসে বেতসীবন, গুমরি' মরে হতাশ মন,
কুঞ্জে নাহি ঝুলন-দোল, মধু মিলনানন্দ আর।

গোঠের ধূলি অঙ্গে মাখি', রাখাল ফেরে উদাস-আঁখি.
ঘুরিছে ভুলে কুসুম তুলে, নাহি সে দেব বন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

যশোদা আজি মলিনা দীনা. লুটায়ে ভূমে চেতনাহীনা,
রোদনে আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচক-বনে বাজে না বাঁশী, নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নরনারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দ হার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

—কালিদাস রায়

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"—'নন্দপুর-চন্দ্র' বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছে? তাঁহার অবর্তমানে বৃন্দাবনের অবস্থা কিরূপ ধারণ করিয়াছে, বর্ণনা কর।

২। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটিতে পাঁচটি স্তবক আছে। প্রতি স্তবকের জন্য এক একটি পৃথক্ অনুচ্ছেদ রচনা করিয়া উক্ত স্তবকগুলির অনুসরণে বৃন্দাবন কিরূপ অন্ধকার হইয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ কর: শ্বসে, গুমরি, ভূমে, লুটিয়া, মিছে, গোঠ।

২। বন্ধনী-মধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও:

(ক) নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার (কোন্‌টি অব্যয়; চন্দ্রের পাঁচটি সমনাম শব্দ; অন্ধকারের বিপরীত শব্দ)। (খ) নন্দপুর-চন্দ্র, ফুল-গন্ধভার, পাপিয়া-পিক-চন্দনা, শারিকা-শুক, হতাশ মন, বেতসী বন, চেতনাহীনা, (ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কাহার লেখা? ঐ কবির লেখা আর ক'টি কবিতার নাম কর।

২। 'শারিকা-শুক' কি? তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেন? আচ্ছা 'দ্বন্দ্ব' বানানটা বলো তো?



[যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ার-কবি—ইনি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, মানসিকতায় কবি। ইঁহার জীবৎকাল ১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে কবি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা জীবন ও জগতের অসঙ্গতিকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; পরবর্তী পর্বে অবশ্য এই কবিই জীবন ও জগতকে সুন্দর ও রোমান্টিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিকে বলা চলে নিঃস্ব, সর্বহারা, অন্ত্যজ মানুষের গৌরব-গাথা। কবি সুগভীর মমতায় ও সমবেদনায় এই সর্বহারা মানুষদের দুর্দশার চিত্র সার্থক শিল্প-সমুজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।]

(১)

পাচনি লইয়া গোরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে,
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণ-ধারা
মাথায় নাহিকো আঁটে;
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষা-নদী,
জুটে না পারের কড়ি,
হারা-বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি';
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, কর গো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

(২)

জ্যৈষ্ঠ-তুপুরে গলদঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙ্গা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা, মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণী-গর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, শ্রদ্ধা কর ;
তারা মানুষের ভাই।

(৩)

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুকু
জুটে নাই হেন বাস ;
তারি খুঁটে যার পিঠে ছেলে বেঁধে রক্তমুখ
তুলিছে মাটির রাশ ;
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ 'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;
মাঝ পথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—

ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, করো গো নতি,
তারা মানুষের স্ত্রী।

(৪)

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা,
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির-নাবালক চাষা !
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে,
বেতসের মত সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি !

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া উহার পূর্ববর্তী পংক্তিটি লেখ :

(ক) তারা মানুষেরি—(প্রথম স্তবক) ; (খ) তারা মানুষের—(২য় স্তবক) ; (গ) তারা মানুষের—(৩য় স্তবক) ; (ঘ) তারা মানুষেরি—(৪র্থ স্তবক)।

২। উপরের প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখিয়া তাহা হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দাও : (ক) 'তারা' বলিতে কবি কাহাদের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন ? (খ) কবি উহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন ? (গ) সাধারণতঃ তাহারা কি জাতীয় ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে ?

৩। তাৎপর্য সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দাও :

(ক) আশা যার ভাসে······কাদা আভরণ ; (খ) যার নিরুপায়······লক্ষ দুঃখঝড় ; (গ) বেতসের মত ·····মানুষেরি জাতি ।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। গদ্যরূপ লেখ : নিবারিতে, তরে, গেহ, মাতি।

২। বন্ধনীমধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :

(ক) পাচনি, গলদঘর্ম, মুষল, নিয়ত, নির্ঝর, আর্দ্র, বেতস (অর্থ)। (খ) আভরণ, আবরণ ; নির্ঝর, নির্জর ; জ্যৈষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ (অর্থের পার্থক্য)। (গ) সন্ধ্যাবধি, নিরুপায় (সন্ধি বিচ্ছেদ)। (ঘ) সভ্য, নাবালক, নির্বোধ, শ্রী (বিপরীত শব্দ)। (ঙ) আশা যার ভাসে **আকাশে আকাশে** মেঘের বুকে (স্থূলাক্ষর একই পদ দুইবার ব্যবহারের তাৎপর্য)। (চ) ছিন্ন বসন, গলদঘর্ম, রক্তমুখ, নির্বোধ, শতাব্দী (ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম)। (ছ) লক্ষী, দূর্ভিক্ষ, শ্রাবন (শুদ্ধ বানান)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'মানুষ' কবিতা কাহার লেখা ? কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবি সভ্যতার কৃত্রিমতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এমন কয়েকটি পংক্তি 'মানুষ' কবিতা হইতে উদ্ধৃত কর এবং তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৩। কবিতাটি তোমার কেমন লাগিল ? কেন ? তুমি চাষা, মজুর, কুলী, মেথর ইত্যাদি মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো ?

বিধির বিধান সত্য হোক্

[নজরুলের জন্ম ১৮৯৮ খ্রী.। মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রী.। ইনি বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' কবি-রূপেই স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত হইয়া আছেন। বাংলা কাব্যাকাশে তাঁহার আবির্ভাব ধূমকেতুর ন্যায়। চলনে, বলনে, ভাবে, ভাষায় যৌবনের তেজোদ্দীপ্ত উচ্ছলতা লইয়া, সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তৎকালীন বাংলাদেশকে তিনি আন্দোলিত কয়িয়াছিলেন। প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা ও গজল গানেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। আলোচ্য কবিতাটিতে তিনি বলিতে চাহেন বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে এই যে পারস্পরিক ভেদাভেদ, তাহার মূলে রহিয়াছে কখনও বা শাস্ত্রের ও ধর্মের দোহাই, কখনও বা জাতের ও রাষ্ট্রের দোহাই। কিন্তু এই সকল মিথ্যা সামাজিক নীতি-নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত সাম্য-মৈত্রী-সৌভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এই প্রয়াসে স্বয়ং ভগবানই তাহাকে শক্তি যোগাইবেন।]

পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক্!
খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে না আর সর্বলোক!

ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে কিসের ভয়?
আঁধারকে তোর কিসের ভয়?
ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো
ভবনটাই সে সত্য নয়!
বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্যকালের তাঁর আলো
বিধির বিধান সত্য হোক্!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কাল নাইক আশ,
কাল তারে কাল করবে গ্রাস।

হাতের খেলা সৃষ্টি এ যাঁর
তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ।
সেই বিধাতায় মাথায় ক'রে
বিপুল গর্বে বক্ষ ঠোক্!
বিধির বিধান সত্য হোক্।

বিধির বিধান মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল,
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
বিধির বিধান সত্য হোক্।

আছেন সত্য মাথার 'পর—
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্।
তোর পথেরই মশাল হয়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র চোখ!
বিধির বিধান সত্য হোক্।

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান;
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান;
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান;
জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই
জগন্নাথের সাম্য-লোক!
বিধির বিধান সত্য হোক্।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। "পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক!"

'পুঁথির বিধান' এবং 'বিধির বিধান' বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? কেন তিনি পুঁথির বিধান 'যাক্ পুড়ে' বলিতেছেন?

২। "কাল তারে কাল করবে গ্রাস"—পংক্তিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি কে? পংক্তিটিতে ব্যবহৃত 'কাল' শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দাও। 'তারে' বলিতে কবি কাহাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

৩। অল্পকথায় উত্তর দাও: (ক) 'বিধির বিধান' মানিতে যাইয়া কি কি বিপদ হইতে পারে? তখন আমাদের কি কর্তব্য? (খ) কবির মতে 'সত্য' কি? 'বিশ্ব-পিতা'র অধিষ্ঠান কোথায়? (গ) জগন্নাথের 'সাম্য-লোক'—এখানে কবির বক্তব্য কি?

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। অর্থ লেখ: খোদকারী, আশ, আগল, রুদ্র, প্রাণ-বেদী, অধিষ্ঠান।

২। বন্ধনীর অন্তর্গত নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও:

(ক) খোদা (দেশী না বিদেশী শব্দ)। (খ) প্রাণ-ঘর, প্রাণ-বেদী, জাত-সমাজ, সাম্য-লোক (ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয়)। (গ) মন্থ, রাজা, গর্ব, রুদ্র, সাম্য (পদান্তর)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। কাজী নজরুলের কবিতা তোমার কেমন লাগে? ছোটদের জন্য লেখা তাঁহার কবিতা পড়িয়াছ? দু'একটির নাম কর। এই কবিতাটির মূল বক্তব্য দু'চার কথায় বুঝাইয়া দাও।

২। নজরুলকে কি জাতীয় কবি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়? এমন আখ্যা দেওয়া কি ঠিক?

৩। নজরুলের মৃত্যু সম্বন্ধে কি জান?

৪। 'বিধির বিধান সত্য হোক্'—এই কবিতাটির একটি ছোট্ট নাম দাও এবং তোমার দেওয়া নামকরণের পশ্চাতে যুক্তি দেখাও।



[সুকান্ত মাত্র ২১ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুবরণ (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) করেন। তাঁহার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে বলিষ্ঠ জীবনের কবি। কবিতাকর্মে শোষণমুক্ত সাম্যের বিধান-প্রতিষ্ঠার বাণীবাহক। যুগোত্তীর্ণ না হউক, যুগ কবিরূপে তিনি চিরকালের মর্যাদা পাইবেন। আলোচ্য কবিতায় সমগ্র নির্যাতিত মানুষের প্রতি কিশোর কবি তাঁহার অভয় বাণী শোনাইয়াছেন। সেই দিন অনতিদূরে যেদিন অত্যাচারের অবসান হইয়া শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া উঠিবে।]

রানার ছুটেছে, তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার! রানার
জানা অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে।
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
অবাক্ রাতের তারারা, আকাশে মিটমিট ক'রে চায়—
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে, হরিণের মতো যায়!

কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন, জোনাকিরা দেয় আলো,
মাভৈঃ রানার, এখনো রাতের কালো।
রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে,— আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি, নেই দেরি নেই আর
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে, দুর্দম হে রানার॥

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

অনুশীলনী

॥ বিষয়াশ্রিত ও পর্যালোচনামূলক প্রশ্নাবলী ॥

১। 'রানার' কবিতাটির প্রথম দুই স্তবক অবলম্বনে অন্ধকার রাত্রির এবং রানারের ছুটিয়া চলার বর্ণনা দাও।

২। "মাভৈঃ রানার এখনো রাতের কালো"—'মাভৈঃ' শব্দটির অর্থ কি ? কবি কেন রানারকে 'মাভৈঃ' বলিতেছেন ? উদ্ধৃত পংক্তি অনুসরণে কবির মনোভাব বর্ণনা কর।

৩। 'রানার' কবিতায় কবি রানারকে কাহাদের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করিয়াছেন ? কবি বলিয়াছেন, রানার রাত্রি ভেদ করিয়া সূর্যোদয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহার অর্থ কি ?

৪। সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও : (ক) রানারের জীবনের দুঃখ কি ? কে কে তাহার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ? (খ) যাত্রাপথে রানারের ভয় কিসে কিসে ? সে সর্বাপেক্ষা ভয় পায় কখন ? (গ) রানারের ছুটিয়া চলাকে কাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে ?

৫। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট কর : (ক) অবাক্ রাতের তারারা আকাশে মিটিমিটি করে চায়। (খ) এর জীবনের···রাত্রির থামে। (গ) দরদে তারার··সহানুভূতির চিঠি।

॥ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ॥

১। বাক্য রচনা কর : ঝুমঝুম, দুর্বার, আবেগে, সহানুভূতি, দুর্দম।

২। বন্ধনীর মধ্যস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও : (ক) ঝুমঝুম, মিটমিট (কি জাতীয় শব্দ)। (খ) দিগন্ত, নির্জন (সন্ধি বিচ্ছেদ)। (গ) বোঝাই-জাহাজ, নির্জন, কালোরাত্রির খাম (ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম)। (ঘ) নির্জন, গ্রাম, শহর, প্রভাত, দুর্দম (পদান্তর সাধন)। (ঙ) কত চিঠি লেখে লোকে (কোন্‌টি কি পদ)।

॥ মৌখিক প্রশ্নাবলী ॥

১। সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা সম্পূর্ণ 'রানার' কবিতাটি পড়িয়াছ ? বলিতে পারো ?

২। সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষদের লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, এমন কয়েকজন কবি এবং তাঁহাদের লেখা ঐ জাতীয় কয়েকটি কবিতার নাম কর।

৩। 'রানার' কবিতায় কবির লেখা কোন্ জায়গা তোমার খুব ভালো লাগিয়াছে বলো। পারিলে স্থানটি উদ্ধৃত করো। আচ্ছা, ঐ পংক্তিগুলো তোমার ভালো লাগিল কেন ?